রাজা ও কবি

সম্পাদনা

অজয় দাশগুপ্ত

সুবর্ণা প্রকাশনী
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০৭৩

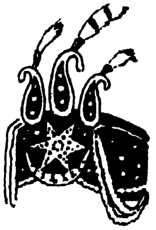
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৫

প্রকাশক : বিমলকান্তি সাহা
সুবর্ণা প্রকাশনী
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : বিমলকান্তি সাহা

ছবি : মদন সরকার

লেজারটাইপ সেটিং : তরুণ মজুমদার
ক্রসলাইন
৬৩/২ডি, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯



আবিষ্কার

এক

আজ মহারাজার মেজাজই আলাদা। দীর্ঘদিন বীরচন্দ্রকে এরকম খোশমেজাজে কেউ দেখেনি। বড় ঈশ্বরী মহারাণী ভানুমতীর মৃত্যুর পর থেকে মহারাজা কেমন যেন হয়ে পড়েছিলেন। কিছুতেই কাজে মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। রাজকার্যগুলো করতে হয় তাই যেন করা, একেবারে দায়সারা গোছের। জরুরী অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নেবার অভাবে সর্বত্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। মহারাজার কিছুতেই মন নেই, দেহভারে ন্যুব্জ হয়ে গিয়েছেন। তাকিয়ে আছেন তবে কিছু দেখছেন বলে মনে হয় না।

বীরচন্দ্রের এই অনাগ্রহ অনীহার সুযোগে প্রাসাদে অবিলম্বে গুজগুজ ফিসফিস রটে গিয়েছিল — মহারাজা কাউকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়ে তাঁর হাতে রাজত্ব সঁপে দিয়ে বৃন্দাবনে চলে যাবেন। এখন কে যে রাজা হবে এই রহস্যজাল ঘনীভূত হয়ে চারদিক গুজবে পল্লবিত হতে লাগল। সবদিক বিবেচনা করলে সদ্যপ্রয়াতা ভানুমতীর পুত্র সমরেন্দ্রর সিংহাসনে আরোহণের সম্ভাবনা বেশি। অবশ্য দ্বিতীয় মহারাণী রাজরাজেশ্বরীর পুত্র রাধাকিশোরের রাজা হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। রাধাকিশোর সমরেন্দ্রর চেয়ে বয়সে বড়। সমরেন্দ্র জ্যেষ্ঠা মহিষীর সন্তান অথচ রাধাকিশোরের অনুজ। দেশের প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন হল, রাজার মৃত্যু হলে অথবা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করলে রাজত্ব করার অধিকার পাবে পাটরাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র। এটা নিয়ম বটে, তবে ত্রিপুরার সিংহাসন হস্তান্তর হওয়ার সময় আগে বিধিটি থোড়াই মানা হয়েছে। বীরচন্দ্র নিজে রাজা হয়েছেন বড় ভাই মহারাজা ঈশানচন্দ্রের কাছ থেকে সিংহাসন পেয়ে। ঈশানচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর আগের দিন এক রোবকারিতে স্বাক্ষর করে রাজ্যের সিংহাসন নিজের নাবালক পুত্র নবদ্বীপকে না দিয়ে ছোট ভাই বীরচন্দ্রকে দিয়ে যান। রোবকারিটি জাল এই নিয়ে ঝগড়া আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বীরচন্দ্রের উত্তরাধিকারের কেলেংকারি মামলার সুবাদে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যাঁরা বীরচন্দ্রের সিংহাসন প্রাপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন আদালতে, প্রশ্ন উঠল তাঁরা প্রয়াত মহারাজার বৈধ সন্তান তো ? মহারাজার স্ত্রী কত, কত পুত্র, কে জারজ আর কে জারজ সন্তান নয়, কে জানে ? রাজঅন্তপুরের এইসব কেচ্ছার আবরণ উন্মোচনে সারা আগরতলা শহরে ঢি ঢি পড়ে গেল। মামলা সবগুলোর এখনও সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয়নি। যদিও বীরচন্দ্র বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের

এক অধ্যাদেশ অনুসারে ত্রিপুরার আইনানুগ মহারাজা হয়ে রাজ্যপাট চালিয়ে যাচ্ছেন । ভানুমতীর মৃত্যুর পর কার্যকারণে উত্তরাধিকারের জটিল প্রশ্নটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বীরচন্দ্র যে কাকে সিংহাসনে বসিয়ে বৃন্দাবনে চলে যাবেন কিছুই আঁচ করা যাচ্ছে না । এ ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। স্ত্রীর মৃত্যুর ফলে বীরচন্দ্র সংসার-বিমুখ হলেও তাতে তাঁর কূটবুদ্ধি কিঞ্চিৎমাত্র কমেছে এ কথা তাঁর অতি বড় শত্রুও ভাবে না । রাধাকিশোর রাজা হতে পারেন, আবার সমরেন্দ্রও হতে পারেন রাজা, আবার এমনও হতে পারে তিনি বৃন্দাবনে গেলেন না, রয়ে গেলেন এখানে এবং দাপটের সঙ্গে রাজ্যপাট চালালেন । সবই সম্ভব — বীরচন্দ্রের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় । ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হতে পারে, ল্যাজে-খেলানোটা তাঁর এক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এবং তাতে তিনি আনন্দ পান । তাঁর খেলার ধরনটা খুব মজার, খেলাটাকে খেলিয়ে খেলিয়ে জটিল থেকে জটিলতর করে তোলেন । তারপর নিজের থেকেই সমস্যার একটা সমাধান বেরিয়ে আসে । বীরচন্দ্র ততদিন অপেক্ষা করেন, কোন তাড়াহুড়ো নেই । এর ফলে ত্রিপুরার রাজকার্যে একটা ঢিলেঢালা ভাব, কোন সিদ্ধান্ত নেই । সিদ্ধান্তহীনতাই হল এ রাজ্যে সিদ্ধান্ত ।

আজ একটি ব্যতিক্রমী দিন বলে মনে হচ্ছে । ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদের রেওয়াজ হল সাধারণত সকাল সকাল রাজসভা বসবে । দুপুর হবার আগেই এগারটার মধ্যে প্রথম অধিবেশন শেষ হবে । রাজ্যের সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো মহারাজার গোচরে আনা হবে, সব শুনে তিনি তাঁর আদেশ জানিয়ে দেবেন । সেই আদেশ আইন হয়ে রোবকারি হিসেবে রাজ্যে ঢোল-সহরৎ সহযোগে প্রচারিত হয়ে যাবে । সভা ভঙ্গ হবার আগে খাস আপিল আদালত বসবে । নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মহারাজার কাছে শেষবারের মত আপিল জানানোর সুযোগ এটা । মহারাজা প্রদত্ত রায় এবং বিবাদীর আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন । খাস আপিল আদালতের পরই মহারাজার গাত্রোত্থান এবং সভাকার্যের আপাতত মুলতুবি । তারপর মহারাজা সমভিব্যাহারে পারিষদরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে যাঁর যাঁর বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করবেন। বাড়ী গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে ভাতঘুম। রাজবাড়ীর নিয়মই এরকম, দুপুরে কোন কাজকর্ম নেই। মহারাজা যতক্ষণ না নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছেন ভরদুপুরে, ততক্ষণ দাসী রমণীরা তার সেবা করে যাবে, বিরাট পাখার মৃদু বাতাস নিদ্রাকে অসময়ে ডেকে এনে চোখের পাতা বন্ধনে আবদ্ধ না করা পর্যন্ত কারোর ছুটি নেই।

ভাতঘুমের পর আবার অপরাহ্ন বেলায় দ্বিতীয় অধিবেশন। মূলতঃ এবারের রাজসভা হল সাংস্কৃতিক। গানবাজনা নৃত্যগীতের সমারোহ। দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞানী গুণীজনেরা এসে রাজসভায় তাঁদের গুণের পসরা পরিবেশন করে পারিতোষিক এবং স্বীকৃতি পাবার বাসনায় অপেক্ষায় থাকেন। সাংস্কৃতিক অধিবেশনে মহারাজার অন্য এক ভিন্নরূপ। সকালের সঙ্গে বিকেলের কোন মিলই নেই। এখন মহারাজা দরাজ তাঁর সকালের নির্মম রূপ একেবারেই অনুপস্থিত। তার বদলে মহারাজা এক ইয়ার দোস্তের মতো, লঘু এবং ফিচলেমিতে ভরা রসের নাগর যেন।

ভানুমতীর মৃত্যুর পর বৈকালিক অধিবেশনের পালা উঠে গিয়েছিল। রাজসভা থেকে নৃত্যগীতের লহরা আর সুরের ঝংকার মুছে গিয়ে এক বৈধব্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। সবই কেজো ব্যাপার— জীবনের যেন আর রঙ রস নেই। আজ সবাইকে অবাক করে দিয়ে মহারাজা বীরচন্দ্র ভাতঘুম অসম্পূর্ণ রেখে আবার উঠে এসেছেন সভায়। কথাটা মুহূর্তের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল রাজপ্রাসাদ এবং তার সংলগ্ন জনপদে। পারিষদরা আনন্দে দিশেহারা হয়ে দৌড়ে ছুটে এলেন রাজসভায়। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন-- যাক, মহারাজার তাহলে সুমতি হল এতদিনে। স্ত্রী কার না মারা যায়। আর স্ত্রীরা তো মারা যাবার জন্যই। তাছাড়া শাস্ত্র বলেছে, ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে, অভাগার মরে গরু। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসর জমে উঠল। সবই যেন প্রস্তুত ছিল, শুধু মহারাজার ইশারার অপেক্ষায় কাল গুণছিল সবাই। ভানুমতীর মৃত্যুতে বিকেলের ফূর্তির সমস্ত আয়োজন প্রাণহীন পাষাণে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, আজ তাতে মহারাজার কল্যাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। বেজে উঠল রবাব, তাতে সুরের ঝংকার ঢেলে দিলেন তানসেনের বংশধর কাশেম আলী খাঁ। এস্রাজ নিয়ে বসলেন গোয়ালিয়র থেকে আসা হায়দার খাঁ। সেতারে প্রাণ সঞ্চার করলেন নিসার হুসেন। চন্দননগরের পঞ্চানন মিত্র ওরফে পাঁচুবাবু পাখোয়াজে বোল তুললেন । সঙ্গে তাঁকে সহযোগিতা করতে বসলেন আর এক দিকপাল পাখোয়াজ বাদক ঢাকার রামকুমার বসাক। কাশ্মীরের অধিবাসী কুলন্দর বক্স পায়ে নূপুর বেঁধে কত্থক নাচবেন বলে, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে মেঝেতে তাল ঠুকতে লাগলেন। দীর্ঘদিন বাদে রাজপ্রসাদ সুরে-তালে গমগম করে উঠল। অন্দরমহলের রমণীরা এতদিনকার মেকি দুঃখী দুঃখী চাহনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাস্যময়ী হেসে একে অন্যের সঙ্গে অর্থপূর্ণ ভাব বিনিময় করলেন। তারা আব্রুর আড়াল থেকে অপরাহ্নের নৃত্যগীতাদির আনন্দরস আস্বাদনের জন্য কাড়াকাড়ি করে ঢলাঢলি সহকারে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলেন।

আনন্দ যখন লঘু থেকে লঘুতর হয়ে শরমের সীমারেখাকে অস্পষ্ট করে ফেলল, তখন মহারাজা বীরচন্দ্রের বয়স্য বিনন্দীয়া আল হাজারী ও খাস আদালতের জজ ভারতচন্দ্রের গোপন সঙ্কেত পেয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে আগত ইমামী বাঈ, বিলোল কটাক্ষের হিল্লোল সহ ঘাগরায় ঝড় তুলে সভায় নৃত্যের বন্যা ডেকে নিয়ে এল । সভায় উপস্থিত বয়স্যেরা বয়স ঝেড়ে ফেলে নড়েচড়ে বসলেন আর মিটি মিটি হাসতে লাগলেন। ইমামী বাঈ বেশ কিছুদিন হল লক্ষ্ণৌ থেকে এসে এখানে রাজসভায় ডাকের অপেক্ষায় বসেছিল। ডাক আর আসে না। আসবে বলে আর মনেও হচ্ছিল না। নৃত্যগীতের পাট উঠে গিয়েছে বলে ব্যাপারস্যাপার থেকে বোধ হচ্ছিল। রাজপ্রাসাদে নটী নিয়ে আমোদপ্রমোদ নতুন কিছু না। তবে বীরচন্দ্রের আমলে এ নিয়ে খুব একটা আহামরি রোশনাই কিছু নেই। রাজমহিষীর মৃত্যুর পর সমস্তরকম প্রমোদানুষ্ঠানের ওপর যবনিকা পাত হয়েছে। লক্ষ্ণৌ থেকে আগত বিগতযৌবনা ইমামী বাঈ অসময়ে আগরতলা এসে যখন কপালকে দুষছিল তক্ষুণি ডাক এলো নেচে গেয়ে বীরচন্দ্রকে ফাগুনের আগুনে মাতোয়ারা করে দেয়ার জন্য। চেহারায় বয়সের ছাপ পড়লেও ইমামী বাঈয়ের অঙ্গের চঞ্চলতায় তার কোন সাক্ষ্য নেই। শারীরিক বাঁধনে কিঞ্চিৎ শিথিলতার ফলে নৃত্যে কিছুটা শ্লথভাব এলেও, ঊর্ধ্বাঙ্গের চাঞ্চল্য এবং নয়নতারার ছলকানি যে-কোন পুরুষের

চিত্তকে বিহ্বল করে তুলতে এখনও সমানভাবে পারঙ্গম। ইমামী বাঈ তার বয়সজনিত ত্বকের কুঞ্চনতাকে পাউডারের প্রলেপ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করেও কেন যে নাচার সঘন মুহূর্তে নিজেকে বারেবারে অনাবৃত করে তুলছে, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। নৃত্যের মদিরায় যখন সভা নেশায় টইটুম্বুর তখন লক্ষ্ণৌ ঘরানার নটী আচমকা একরাশ ফাগের আবীর মহারাজা বীরচন্দ্রের দিকে ছুঁড়ে মারল। সভাসদেরা সঙ্গে সঙ্গে প্রমাদ গুণলেন, মহারাজ না হঠাৎ গোঁসা করে বসেন। বীরচন্দ্র মুচকি হাসলেন। সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সাহস পেয়ে এরপর ইমামী বাঈ যে কান্ডটা করল তা দেখে সভাসদদের সবার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। যা কোনোকালে ঘটেনি, যা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে না সেই অঘটন আজ ঘটল। লক্ষ্ণৌর ইমামী বাঈ নৃত্যের হিল্লোলে উচ্ছলিত হয়ে দিকভ্রান্তের মত হুমড়ি খেয়ে বীরচন্দ্রের কোলে গিয়ে বসে পড়ল। নটীর স্পর্ধা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল সব বাদ্যযন্ত্র। সভাসদরা ভয়ে বিবশ হয়ে মাথা নত করে ফেললেন। এখন যে কি হবে, একমাত্র ঈশ্বর জানেন। বীরচন্দ্রের কুপিত রূপ তো কেউ দেখেনি সামনাসামনি, আজ দেখবে । আজ কত গর্দান যে মাটিতে লুটাবে তার ইয়ত্তা নেই। সমস্ত নাটের গুরু হল আল হাজারী ও খাস আপিল আদালতের জজ ভারতচন্দ্র দেববর্মা । আদালতের জজগিরি যাবে তার আজ। ভারতচন্দ্র ভেবেছিলেন, মহারাজার মন খারাপ, স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। খানিক ফূর্তিফার্তা হলে মন্দ হয় না। ইমামী বাঈও অনেকদিন ধরে পাউডার মেখে বসে আছে, একটু নাচগান হলে বেশ হয় । মহারাজার মন-মেজাজটা ভালো হয় । আর কিছু না । সত্যি কথা কি, ভারতচন্দ্রের ইচ্ছাতেই আজকে দীর্ঘদিন পর এই প্রমোদানুষ্ঠানের আয়োজন । নটী, তুই অঙ্গিভঙ্গি করে নেচেছিস, সে ভালো। আবীর ছুঁড়েছিস তাও মেনে নেয়া গেল । কিন্তু কোন সাহসে মহারাজার বুক লেপ্টে কোলে গিয়ে বসে পড়েছিস ? কেউ কিছু কথা বলার আগেই ভারতচন্দ্র ধবধবে ফরাস পাতা গদি ঠেলে ফেলে উঠে দৌড়ে গিয়ে মহারাজার কোল থেকে ইমামী বিবিকে হেঁচকা টান মেরে নামিয়ে নিয়ে এলেন । তারপর আভূমি আনত হয়ে বললেন, মহারাজ, আমাকে মার্জনা করুন । আমি বুঝতে পারি নি এই নটী আপনার কোলে গিয়ে চেপে বসবে । সমস্ত দোষ আমার মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন।

বীরচন্দ্র ইতিমধ্যে তাৎক্ষণিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেছেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, যা হবার হয়েছে। তোর আর দোষ কি। এ নটী সঙ্গীতশাস্ত্রের কিছুই জানে না। বাঈটিকে বাইরে নিয়ে যা। সেখানে প্রকৃতিপুঞ্জের মনস্তুষ্টি করতে পারবে। তার মুজরা শেষ হলে নগদ টাকা গুণে দিয়ে বিদেয় করে দিস।

এত বড় একটা অমার্জনীয় অপরাধ মহারাজা কোন শাস্তি না দিয়ে এমনি এমনি ক্ষমা করে দিলেন দেখে সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে একে একে সভাকক্ষ ত্যাগ করতে লাগলেন। ভারতচন্দ্র নীরবে মাথা নীচু করে পা টিপে টিপে চলে যাচ্ছিলেন । বীরচন্দ্র তাঁকে পিছু ডাকলেন। ভারতচন্দ্র ভেবেছিলেন তিনি বুঝি এযাত্রায় পিতৃপুরুষের আশীর্বাদে বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু ডাক শুনে মনে হল ফাঁড়া এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। বীরচন্দ্র হাসিখুশী মেজাজে বললেন, ভারত, আমাদের গ্রামদেশের একটা কথা আছে না, কাওয়া চেনে ঘাওয়া কাঁঠাল । তোরা হলি

কাওয়া — কাকের গোষ্ঠী । যা, বাইরে কোথাও কাঁঠাল নিয়ে বস গে । যাওয়ার আগে আমার জন্য একটা কাজ করে যা । রাধারমণ ঘোষ আর মদন মিত্রকে পাঠিয়ে দে । এখন এখানে কাব্যের আসর বসবে। কাব্যরস পান করব আমি । একটা দারুণ কবিতার বই আমার হাতে এসেছে । যা তোরা ভাগ্ । পুরো সন্ধ্যেটা মাটি করে দিয়েছিস। যদি কবিতার বইটি না পেতাম তবে তোর কপালে দুঃখ ছিল, বুঝলি । যা এখন যা ।

দুই

মহারাজা বীরচন্দ্র এবার হাতির দাঁতের সিংহাসনে না বসে সোজা নেমে এসে জাজিম বিছানো মেঝেতে রাধারমণ ঘোষ আর মদন মিত্রের মুখোমুখি বসলেন। রাধারমণ সঙ্গে সঙ্গে শালু কাপড়ে মোড়ানো বৈষ্ণব পদাবলীর বইগুলো সাজিয়ে রাখলেন । কোন্ পদাবলী আজ পাঠ হবে মহারাজা বললেই রাধারমণ সুললিত কণ্ঠে পাঠ শুরু করতে প্রস্তুত । প্রস্তুত মদন মিত্রও । তিনি অবশ্য পদাবলী আনেননি, তিনি এনেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের করুণ ও বীররসের ব্রজাঙ্গনা এবং বীরাঙ্গনা কাব্য । মহারাজার কোনটা ভালো লাগবে আগে থেকে বলা মুশকিল । অনেকদিন ধরে কোন কাব্যপাঠের আসর বসছে না, বীরচন্দ্রের মেজাজ মর্জি অনেকদিন ধরে জানা নেই।

পরিচারিকা একটা বাতিদান রেখে সরে গেলে বীরচন্দ্র আলোটাকে উসকে দিয়ে নিজেরই আলখাল্লার জেব থেকে একটা ক্ষীণকায় পুস্তক বের করে বললেন, আজকে এই কবিতার বই থেকে কবিতা পড়া হবে । পদাবলী থাক। ইমামী বাঈয়ের ধাষ্টামোতে মেজাজটা খিঁচড়ে আছে । রাধারমণ তুমি শুরু করো, এই ধরো বইটা ।

রাধারমণ কবিতা পাঠ করার শুরুতেই হোঁচট খেলেন । এই কবিতার বইটি তিনি আগে কখনও দেখেন নি, কি সুরে কি ছন্দে পড়বেন তা তাঁর জানা নেই। আগে থেকে তিনি রেওয়াজ বা রপ্ত করেও আসেন নি । মহারাজা রাধারমণের অস্বস্তির কারণটুকু ধরতে পারলেন। বীরচন্দ্র ক্ষমাসুন্দর হাসি হেসে বললেন, ঠিক আছে। আমিই পড়ছি। তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। কিছুক্ষণ আগে ভারতচন্দ্রকে ক্ষমা করেছি এখন তোমাদের ক্ষমা করলাম। আসলে আজকে মেজাজ আমার খুব শরীফ। কেন জানো তো, এই বইটিই এর জন্য দায়ী। এত সুন্দর কবিতার বই আমি আগে কখনও পড়িনি। এত সরল অথচ গভীর, আবার এত স্বচ্ছ অথচ হৃদয়গ্রাহী যে কবিতা হতে পারে তা আমার ধারণার মধ্যে ছিল না। ঠিক আছে আর কথা নয়, আমিই এখান থেকে একটা কবিতার অংশ পড়ছি তোমরা শোনো। গলা কেশে ভরাট কণ্ঠে বীরচন্দ্র দীর্ঘলয়ে কবিতা পড়তে শুরু করলেন—

> হয়ত জান না, দেবী, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
> নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া
> গেছি দূরে, গেছি কাছে সেই আকর্ষণ আছে
> পথভ্রষ্ট হইনাক তাহারি অটল বলে।

নহিলে হৃদয় মম   ছিন্ন ধূমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশ তলে।

কবিতাপাঠ বন্ধ রেখে বীরচন্দ্র উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যেন কতদূরে চলে গেছেন নিজেই জানেন না। প্রয়াতা স্ত্রী ভানুমতীর স্মৃতি তাঁকে আবেশে আবৃত করে রেখেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। কবিতার বইটি উল্টেপাল্টে অন্য একটি পৃষ্ঠায় থমকে দাঁড়ালেন। কান্নাপ্লুত কণ্ঠে কবিতাপাঠে আবার মগ্ন হয়ে পড়লেন।

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ
এপারে দাঁড়ায়ে, দেবী, গাহিনু যে শেষ গান
তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়—
একটি নয়ন জল তাহারে করিও দান।
আজিকে বিদায় তবে আবার কি দেখা হবে—
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান ?

পাঠ শেষ করে বীরচন্দ্র ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাধারমণ এবং মদন মিত্র মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। এঁরা এখন কি করবেন ? মহারাজা কাঁদলে কি করা তাঁদের কর্তব্য এঁরা ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। তবে দু'জনে তাঁরা এটুকু বুঝেছেন যে, কবিতা মহারাজার শোকাকুল হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। স্ত্রী বিয়োগজনিত ভগ্ন হৃদয়ের জ্বালাকে স্নিগ্ধতার প্রলেপ দিয়ে জুড়িয়ে দিয়েছে কবিতা। যে কবিতাপাঠের সময় পাঠকের চোখে জল চলে আসে এবং কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে যায় আবেগে, সে কবিতা নিশ্চয়ই রসোত্তীর্ণ কবিতা। এই শ্রেণীর কবিতা সত্যিই বিরল। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন বীরচন্দ্র। সময় নীরবে বয়ে চলেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। বীরচন্দ্র যখন চোখ খুললেন মদন মিত্র যে সামনে বসে আছেন তা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। কবিতার বইটি ভাঁজ করে বন্ধ করলেন। তারপর কবিতার নম্রতাকে ছুটি দিয়ে কণ্ঠস্বরে রাজকীয় সহজাত স্বভাব ফিরিয়ে এনে বললেন, রাধারমণ, তোমার ওপর একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। এই কবিতার বইয়ের কবিকে তুমি আমার রাজসভায় নিয়ে আসবে, বুঝেছো ?

আজ্ঞে, কবির নাম সাকিন ইত্যাদি যদি বলেন তবে মহারাজার আদেশ আমি পালন করতে পারি। রাধারমণ ঘাড় চুলকে ধীরে ধীরে বললেন।

কবির নাম শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কবিতার বইটির নাম 'ভগ্নহৃদয়'। তোমরা কি চেনো কেউ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভদ্রলোককে ? বীরচন্দ্র বইটির প্রচ্ছদে চোখ রেখে বললেন।

রাধারমণ নঞর্থক ঘাড় নাড়লেন। তিনি চেনেন না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে কাউকে। মহারাজার দৃষ্টি মদন মিত্রের দিকে পড়তেই মদন মিত্র আমতা আমতা করে বললেন, আজ্ঞে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে কারোর নাম আমি শুনিনি।

বীরচন্দ্র ধমকে বললেন, তোমরা দু'জনেই অকর্মের ঢেঁকি। তোমরা আমার মতই

কূপমন্ডুক। চারদিকের কোন খোঁজখবরই রাখো না। এত বড় একজন কবি যাঁর কবিতা পড়ে চোখের জল বাঁধ মানে না, তার নাম তোমরা শোনো নি । তোমরা নিজেরা আবার নিজেদের কবি বলে বড়াই করো । কবিরা কবির খবর রাখে না । তোমরা কেমনতরো কবি ? ছিঃ !

রাধারমণ ঘোষের হাতে কবিতার বইটি তুলে দিয়ে বীরচন্দ্র বললেন, আমি কোন কথা শুনতে চাই না, কোন কথা জানতে চাই না । আমি চাই আমার রাজসভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির দ্বারা অলংকৃত হউক।

বীরচন্দ্রের এই চাওয়া বা ইচ্ছা খুব একটা অলীক কিছু নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেখানে যেখানে রত্নের সন্ধান তিনি পেয়েছেন সেখান থেকে তাঁদের তিনি কুড়িয়ে এনে রাজসভা সাজিয়েছেন। ধ্রুপদী সংগীতের অন্যতম প্রবাদপুরুষ যদুভট্টকে রাজসভায় নিয়ে এসে 'তানরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অযোধ্যার কাশেম আলী খাঁ, কাশ্মীরের কুলন্দর বক্স, উত্তরপ্রদেশের নিসার হোসেন, বারানসীর চান্দী বাঈজি, খেয়াল গানে পারদর্শী মিঠ্ঠু খাঁ ও তমদ্দক হোসেন, টপ্পা গায়ক হুসন খাঁ আর সরোদিয়া আহম্মদ খাঁ বীরচন্দ্রের আহ্বানে এসেছেন তার রাজসভাকে অলংকৃত করতে। সত্যি কথা বলতে কি, এই সময়ে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলির দরবার বাদ দিলে ভারতের কোনো রাজসভা বীরচন্দ্রের সংগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারবে না । বীরচন্দ্রের দরবার অন্য সমগ্র রাজন্যবর্গের মধ্যে মধ্যমণি স্বরূপ । সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বীরচন্দ্রের রাজসভায় নিয়ে আসার প্রস্তাবটি কোন মতেই অযৌক্তিক ও অবাস্তব নয় ।

বীরচন্দ্র 'ভগ্নহৃদয়' বইটি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার লোক। কেননা, 'ভগ্নহৃদয়' বইটি ছাপা হয়েছে কলকাতায় বাল্মীকি যন্ত্রে । শ্রী কালীকিংকর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

তারপর রাধারমণকে বললেন, তুমি কলকাতায় বাল্মীকি প্রেসে গিয়ে প্রথম খোঁজ করো। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠিকানা বের করে তবে তাঁর কাছে হাজির হয়ে আমার কথা বলো। বলবে, সমস্ত সুখ সুবিধে এখানে আমি দেবো, আমার এখানে থাকতে তাঁর অসুবিধে হবে না। তাঁর মত আরও অনেকে আছেন, ভালোই লাগবে তাঁর।

বীরচন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আপনমনে নিজেই বলতে লাগলেন, 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে আমার মনে হচ্ছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী বা নিকট আত্মীয় কেউ মারা গিয়েছেন । 'ভগ্নহৃদয়' হল আমার জন্য, আমার মত শোকসন্তপ্ত হৃদয় জুড়োবার গাঁথা । ভদ্রলোকের বয়স তাঁর কবিতাপাঠ করে বোঝা খুব মুশকিল। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, তাঁর বয়স আমার মতই পঞ্চাশ বা তার কাছাকাছি । আমার মত বয়স বলছি এজন্য যে নইলে আমার মনের বেদনা, ভগ্নহৃদয়ের কথা এত গভীর অথচ সহজ করে কবিতায় রূপ দিতে পারতেন না তিনি ।

মদন মিত্র বললেন, মহারাজ, কলকাতা খুব বড় শহর। বাল্মীকি প্রেস খুঁজে বের করা

অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন । তবে আমার মনে হচ্ছে যেহেতু খাস আপিল আদালতের জজ ভারতচন্দ্রবাবুর ছেলে মহিম কিছুদিন কলকাতায় পড়াশুনো করে ফিরে এসেছে, আপনি অনুমতি করলে মহিম রাধারমণবাবুর সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারে ।

মহিমের নাম শুনেই বীরচন্দ্র ভ্রূকুটি করে উঠলেন। ছোঁড়াটাকে তিনি বেশ আদর করতেন। রাজদরবারে তাঁর পার্শ্বচর বা এডিকংয়ের চাকুরীও তিনি দিয়েছিলেন। বড় ঈশ্বরী প্রয়াতা ভানুমতী মহিমকে খুব স্নেহ করতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে ধুমধাম করে মহিমকে ভানুমতী বিয়ে করিয়ে দেন। কিন্তু এহেন প্রিয়পাত্র মহিমের ওপর ইদানিং রাজদরবারে আসা বা সাক্ষাৎমানা জারী হয়েছে। বীরচন্দ্র জানতে পেরেছেন, মহিম সমরেন্দ্র বনাম রাধাকিশোরের সিংহাসন পাবার লড়াইয়ে রাধাকিশোরের হয়ে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। তাই বীরচন্দ্র মহিমের জন্য রাজপ্রাসাদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অপত্য স্নেহ এক জিনিস আর রাজধর্ম অন্য। দুটো এক সঙ্গে অচল ।বীরচন্দ্র জানেন, মহিম যখন কলকাতায় পড়ত তখন সে কলকাতার বিশিষ্ট লোকজনের বাড়ীতে যাতায়াত করত। সে সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সেরকম কারোকে চেনা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। মদন মিত্রের পরামর্শ অনুসারে মহিমকে রাধারমণের সঙ্গে কলকাতায় পাঠালে একদিক দিয়ে ভালো হয়। আবার মহিমকে ডেকে আনার একটা অন্য অর্থও হবে, মহিমের শাস্তি রদ হওয়া মানে বীরচন্দ্র নিজেও একদিকে ঝুঁকে যাচ্ছেন। যত ভাবা যায়, ততই ঝামেলা।

বীরচন্দ্র হঠাৎ বললেন, ঠিক আছে। হারামজাদা মহিমকে ডাকো। কলকাতায় তাকে পাঠানো হবে কি হবে না পরে ঠিক হবে। তবে তার কাছে জেনে নেয়া যাক সে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চেনে কিনা। তার ঠিকানা জানে কি না ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে মহিম এসে উপস্থিত। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললে, মহারাজা, আমাকে তলব করেছেন ?

মহারাজা কপট গাম্ভীর্যের ভান করে বললেন, হারামজাদা, কোথায় থাকিস ? বে-আদপ কোথাকার !

আজ্ঞে । কাঁপতে কাঁপতে বলল মহিম ।

বীরচন্দ্র নম্র গলায় বললেন, তুই শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে কাউকে চিনিস ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটি আগে কখনো শুনেছিস ?

আগুপিছু কিছু না বুঝে মহিম সাহসে ভর করে বলল, কলকাতার চিৎপুরে নাখোদা মসজিদ পেরিয়ে জোড়াসাঁকোতে এক ঠাকুর পরিবার থাকে। সে পরিবারের একজনকে আমি জানি তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আপনি কি মহারাজা তাঁর কথা বলছেন ?

বীরচন্দ্রের চোখ আবিষ্কারের সাফল্যে চকচক করে উঠল ।তিনি রাধারমণের সঙ্গে চোখাচুখি করে হাসলেন।

মহিম জানাল, কলকাতার হেয়ার স্কুলে পড়ার সময় তার এক সতীর্থ ছিল তার নাম বলু।

ভালো নাম বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর । জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর ছেলে সে। বলুর সূত্রে মহিম জোড়াসাঁকোতে একাধিকবার গিয়েছে । বলুর অনেক কাকা আর পিশি। বলুর বাবা জেঠু কাকা পিশিরা সংখ্যায় সাকুল্যে পনের জন । রবিকা হলেন চৌদ্দ নম্বর । এই রবিকা হলেন সম্ভবত 'ভগ্নহৃদয়'-এর কবি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বীরচন্দ্র এবার রাধারমণের দিকে তাকিয়ে বললেন, নাও এবার হলো তো। সব জানলে। কাল তুমি কলকাতা একাই রওনা হয়ে যাবে। সব খুলে বলবে রবিবাবুকে। পারলে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। আজ্ঞে যদি না আসেন। রাধারমণ অজানা আশঙ্কার কথা বলে রাখলেন আগেভাগে।

যদি না আসেন মানে? চেষ্টা করবে। যদি কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখো, তবে শেষ চেষ্টাটি করবে । বীরচন্দ্র অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, শেষ চেষ্টাটি কি করতে হবে মনে আছে তো?

আজ্ঞে, আছে। রাধারমণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিলেন।

আজকের মত কাব্যপাঠের আসর শেষ । মদন মিত্র এবং রাধারমণ বইপত্র গুছিয়ে বগলদাবা করে উঠে পড়লেন। মহিম তখনও হাঁটু গেড়ে বসে আছে, কি করবে বুঝতে পারছে না।

বীরচন্দ্র এগিয়ে এসে হাত ধরে মহিমকে তুলে দাঁড় করালেন। চোখে চোখ রেখে বললেন, এখন থেকে ভাল হয়ে চলবি, দলাদলিতে থাকবি না, পাকামো করবি না, বুঝেছিস? যা, কাল থেকে আবার কাজে আসবি । তোর সাক্ষাৎমানা উঠে গেল। তুই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিনিস, তাঁর ঠিকানা বলতে পেরেছিস এ জন্য তোর সব কসুর মাপ হয়ে গেল। তোকে ক্ষমা করে দিলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ তোকে এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিলেন ।

তিন

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দোতালার একটি কোণের ঘরে একজন তরুণ যুবা গলা সাধছিলেন। সাধছিলেন বলার চেয়ে বরং বলা ভালো একটি গানে সুর আরোপ করছিলেন। গানের প্রথম লাইনটিতে ঘুরে ফিরে সুর দিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করছিলেন তিনি — 'আমায় বলো না গাহিতে বলো না'। একটি অদ্ভুত ব্যাপার হল তরুণ যুবার কণ্ঠস্বরে পুরুষালির চেয়ে মেয়েলিপনা বেশী। রমণীজনোচিত কণ্ঠ তাঁর, মিঠে এবং সুরেলা। সুর সাধনার সময়ে সেই ঘরে এসে ঢুকলেন রাধারমণ ঘোষ। রাধারমণের আবির্ভাবে সংগীতের রেওয়াজে বিঘ্ন ঘটলেও গায়ক তা গায়ে মাখলেন না, শুধু জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন । রাধারমণ কিছুটা বিব্রত হয়ে বললেন, আমি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি ।

তরুণ যুবা সলজ্জ হেসে বললেন, আমি শ্রীযুক্তবাবু নই । নিতান্তই রবি ।

রাধারমণ হতচকিত হয়ে গিয়েছেন । কিছুই মিলছে না । তাঁর ধারণা ছিল 'ভগ্নহৃদয়'-এর

কবি হবেন প্রৌঢ়, মহারাজা বীরচন্দ্রের বয়সের কাছাকাছি । তিনি হবেন গুরুগম্ভীর এবং বিষাদের প্রতিমূর্তি। কিন্তু তার বদলে রাধারমণ দেখলেন, এ এক ছিপছিপে লম্বাপানা তরুণ, মুখের আদল দীঘল, চোখ নাক ভ্রূ সব যেন তুলি দিয়ে আঁকা। বাবরি চুল ঘাড়ের উপর লেপ্টে আছে । অল্প দাড়ি পাতলা থুতনির নিচে ছড়ানো। চুল দুপাশে পাট করা, মধ্যিখানে সিঁথি। রবিবাবুর বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে হয়ত। রাধারমণবাবুর মনে হল বয়সে নবীন হলে কি হবে, রবিবাবুর চাহনি এমন উদাস এবং মায়াময় যে তাঁর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকলে মন প্রসন্নতায় ভরে যায় ।

রাধারমণ প্রসন্নচিত্তে বিনীত ভাবে বললেন, আমি এসেছি আগরতলা থেকে। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। মহারাজার পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আমি। একটি ব্যাপারে আপনার সম্মতি আদায় করতে পাঠানো হয়েছে আমাকে ।

রবিবাবু অবাক হলেন । ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রের প্রস্তাব, সম্মতি — কিছুর সঙ্গে কিছুর তিনি কোন যোগাযোগ খুঁজে পাচ্ছেন না । ভীষণ অসহায় বোধ করলেন তিনি । শেষে মরিয়া হয়ে জিগ্যেস করলেন, কি ব্যাপার বলুন তো । আমি তো আপনাদের মহারাজাকে চিনি বলে মনে করতে পারছি না । তাছাড়া তিনি আমাকেই বা চেনেন কি করে ?

আজ্ঞে, সে কথাটিই তো আমি বলতে এসেছি। আপনার 'ভগ্নহৃদয়' তিনি আগরতলায় বসে পড়েছেন। তাঁর দারুণ ভালো লেগেছে। যখনই তিনি আপনার কবিতা পড়েন, তখনই চোখের জলে ভেসে যান। কিছুকাল আগে তাঁর বড়মহিষীর মৃত্যু হয়েছে, ইদানীং তাঁর নিজের শরীরও ভালো যাচ্ছে না । নতুবা তিনি নিজেই আসতেন আপনাকে বলতে যে, আপনার কবিতার তিনি গুণমুগ্ধ পাঠক। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে রাধারমণ ক্ষণিকের জন্য থামলেন। রবিবাবুর শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল । একজন রাজার তাঁর মত অর্বাচীন এক কবির কবিতা ভালো লেগেছে এবং তা জানাতে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সুদূর আগরতলা থেকে এখানে পাঠিয়েছেন যা ভাবাই যায় না, যেন এক দিবাস্বপ্ন । এই শেষ নয়, বিস্ময়ের আরও বাকী ছিল যেন।

একথা সেকথার পর রাধারমণ টুক করে আসল কথাটি পাড়লেন। বললেন, মহারাজার ইচ্ছে, আপনি আগরতলায় এসে ত্রিপুরার রাজসভাকে অলংকৃত করেন।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। রবিবাবু অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপারটা কি আপনি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো।

রাধারমণ হাসলেন। অর্থময় হাসি হেসে বললেন, ব্যাপারটা সোজা। ত্রিপুরার রাজসভাকে আপনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। যদুভট্টের মত জ্ঞানীগুণীরা আছেন সেখানে। আপনি এলে ষোলকলা পূর্ণ হয়। মহারাজার অভিলাষ আপনি পূর্ণ করবেন, এই প্রত্যাশা নিয়ে এসেছি। আপনি হবেন সভাকবি, আপনার সাম্মানিক দক্ষিণা অন্য কারোর

চেয়ে কম হবে না। সমস্ত রকম সুযোগসুবিধের ব্যবস্থা করা হবে আপনার জন্য। আপনি রাজী হলে, বাকীটুকু করার দায়িত্ব আমার।

আপনি মহারাজাকে বলবেন, আমি তাঁর প্রস্তাবে নিজেকে বিশেষ সম্মানিত বোধ করছি। ত্রিপুরার রাজসভার সভাকবির পদ অলংকৃত করতে পারলে আমি খুব খুশী হতাম। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে শিলাইদহে জমিদারিতে চলে যেতে হবে। আমি দুঃখিত।

রাধারমণ রবিবাবুর প্রত্যাখানে মর্মাহত হলেন। খুবই দুঃখ করে বললেন, আপনাকে একটা কথা বলি রবিবাবু। আপনি আমার চেয়ে বয়সে ছোট কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, শিলাইদহ জমিদারিতে আপনি যা সম্মান দক্ষিণা পাবেন তার চেয়ে অনেক বেশী পাবেন ত্রিপুরার রাজদরবারে যোগ দিলে। সঠিক টাকার অংকটা আমি এখনই বলতে পারব না— তবে তা যে নিশ্চয়ই বেশী হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আপনি আমার প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন, আশা করি।

এবার রবিবাবু হো হো করে হেসে ফেললেন। বললেন, আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা পুনর্বিবেচনার প্রশ্নই ওঠে না। বাবামশাই শিলাইদহের জমিদারি দেখাশোনার ভার আমার ওপর ন্যস্ত করেছেন। আমাকে সেখানে যেতেই হবে। যাওয়ার আগে জোড়াসাঁকোতে আমাকে সেরেস্তারির কাজ হাতে কলমে ট্রেনিং দিতে হয়েছে। বিলেতে কিছুকাল ছিলাম বলে বাবামশাইয়ের মনে হয়েছে দেশের মাটি থেকে শিকড়ের সংযোগ হারিয়েছি আমি। শিলাইদহে পোস্টিং দিয়ে উন্মূল আমাকে আবার যথাযথ প্রোথিত করতে চান বাবামশাই। সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও আমি কোথাও যেতে পারি না। আপনি আপনাদের মহারাজাকে আমার অক্ষমতার কথা বুঝিয়ে বলবেন।

এই স্বল্প সময়ের আলাপচারিতায় রাধারমণবাবু বুঝলেন বিলাত ফেরত রবিবাবু একজন প্রতিভাবান কবিই নন, তিনি একজন ক্ষুদে জমিদারও। তাঁর পিতামহ হলেন ব্রিটিশ 'প্রিন্স' উপাধিধারী কলকাতার একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য লোক। এ হেন রবিবাবুর পক্ষে ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে কবির চাকুরী নিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবার প্রস্তাব যতই লোভনীয় হোক না কেন মোটেই গ্রহণীয় হবার নয়।

আগরতলায় শেষ পর্যন্ত রবিবাবুকে নিয়ে যেতে না পারলে রাধারমণের কৃতিত্বহানি হবে সন্দেহ নেই, তার ওপর ভয় তিনি মহারাজার বিরাগভাজনও হতে পারেন। এই আশঙ্কা তিনি আগেভাগেই করেছিলেন। এখন তাই সত্যি হল। মহারাজা বীরচন্দ্রের কথা মত এখন শেষ চেষ্টা করতে হবে রাধারমণকে।

শেষমেষ রাধারমণ মরিয়া হয়ে বললেন, দেখুন রবিবাবু আগরতলায় আপনি সভাকবি হয়ে যাবেন কি যাবেন না তা আপনার একান্তই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এব্যাপারে আমি পীড়াপীড়ি করব না। তবে আপনার অবগতির জন্য আমি বলছি, আমাদের মহারাজা বীরচন্দ্রের পরিচয় শুধু তিনি একজন মহারাজা তাই নয়, তিনি একজন কবিও। একজন কবি আর একজন কবির

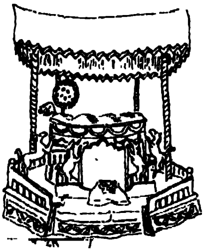
সঙ্গে সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান এবং একজন কবি অন্য একজন কবির অনুরাগী এই কথাটা জানাতে আমি আসলে এসেছি। একজন কবিই আর একজন কবির প্রতিভা সম্ভাবনাকে সম্যক বিকশিত হবার আগেই আন্দাজ করতে পারেন। আমাদের কবি মহারাজা আপনার মধ্যে অনন্ত কাব্য প্রতিভার সন্ধান পেয়েছেন আপনার 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে এবং স্বীকৃতি জানাতে আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।

রবিবাবু ভীষণ সংকোচ বোধ করছিলেন। লজ্জিতভাবে বললেন, এভাবে বলবেন না। আমি লজ্জা পাচ্ছি। কিছুক্ষণ ভেবে হঠাৎ রবিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, মহারাজা বীরচন্দ্রের বয়স কত ? তিনি কি আমার মত বয়সী ?

রবিবাবুর কথা শুনে হো হো করে হাসতে লাগলেন রাধারমণ। হাসি থামিয়ে বললেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি যদি ভুল না করি, আপনার বয়স হবে চব্বিশ-পঁচিশের মত। যদি তাই হয়, আমাদের মহারাজার বয়স আপনার প্রায় দ্বিগুণ।

বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙে গেল রবিবাবুর। এ তো অদ্ভুত। অর্দ্ধশত বয়সী একজন প্রৌঢ় তাঁর মত এক তরুণ যুবার কবিতা পাঠ করে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন। স্ত্রী বিচ্ছেদের বিয়োগ-ব্যথায় তাঁকে কবিতা জোগায় অসীম প্রশান্তি, মুছে দেয় স্নিগ্ধ প্রলেপে ভগ্নহৃদয়ের জ্বালা। এটা সম্ভব একমাত্র কবিতা বলেই। কবিতাই পারে একমাত্র এরকম অভাবনীয় কান্ড ঘটাতে। কবিতা হল অঘটন ঘটন পটিয়সী। কবিতা বয়স, বৃত্তি এবং দূরত্বের বাধাকে অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে। 'ভগ্নহৃদয়'-এর প্রশংসা শুনে রবিবাবু প্রথমে খুশীতে রোমাঞ্চিত হলেও এখন তিনি নিজের ভেতরের বিচিত্র এক অনুভূতিতে অনুরণিত হতে লাগলেন। কবিতা এই শব্দের নির্মাণ। এক আলোকস্তম্ভ যা ব্যক্তিগত দুঃখবেদনা অপ্রাপ্তি থেকে উত্তীর্ণ হবার পথ দেখায়, যা জীবনকে এনে দেয় পূর্ণতা। মহারাজার প্রেরিত দূতের উপস্থিতিতে রবিবাবু এক নতুন অজানা সত্যে উদ্ভাসিত হলেন। তার কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমে উঠল। রবিবাবু স্বগতোক্তির সংগোপনে বিড়বিড় করে মহারাজা বীরচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করে বিশাল এক দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ করেছেন। আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি আপনার বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। যিনি উপরের শিখরে থাকেন তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তাকেও দেখতে পান। আপনি আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছেন, আপনাকে আমার প্রণাম।

তন্ময়ভাব থেকে নিজেকে তুলে এনে রবিবাবু রাধারমণকে বললেন, আপনি মহারাজা বীরচন্দ্রকে বলবেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছি। তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন।



উত্তরাধিকার

এক

মদন মিত্র বুঝতে পারেন নি এই সময়ে বীরচন্দ্র মানা ঘরে থাকবেন। মানা হল নিষেধ। মানা ঘর মানে হল নিষেধ ঘর অর্থাৎ এ ঘরে অন্য সবার প্রবেশ নিষেধ। অবশ্য মদন মিত্রের বেলায় এ নিষেধ প্রযোজ্য নয়। মহারাজা বীরচন্দ্রের তিনি সভাকবি এবং বয়স্য। বীরচন্দ্র মদন মিত্রের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করেন। মাঝেমাঝে এমন সব ইয়ার্কি ফাজলামো করেন, যা দরবারের অন্য কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। সবাই জানে, মদন মিত্র হলেন বীরচন্দ্রের পেয়ারের লোক। তাঁর সাত খুন মাপ। মদন মিত্র হলেন কীর্তনীয়া এবং পরম বৈষ্ণব। তাঁর আচার আচরণ এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে সর্বত্র বৈষ্ণব জীবনের সুস্পষ্ট ছাপ। বীরচন্দ্র নিজে বৈষ্ণব হলে কি হবে জীবন তাঁর তথাকথিত নিরামিষাশী নয়। জীবনকে তিনি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে ভালোবাসেন।

মানা ঘরে বীরচন্দ্র বসে বসে ক্যামেরার লেন্সে বন্দী করেন নারী সৌন্দর্য। নারীর সুষমা এবং অতীন্দ্রিয় রূপকে জীবন্ত ধরে রাখার এক অন্তহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বীরচন্দ্র। বীরচন্দ্রের ক্যামেরায় তোলা ছবি সম্প্রতি আমেরিকার ফটোগ্রাফার জার্নালে ছাপা হয়ে সুধীজনের প্রশংসা কুড়িয়েছে। মানা ঘরে বীরচন্দ্র মানে হল এখন তিনি ক্যামেরার কলাকৌশল নিয়ে ব্যস্ত। এখন কেউ মহারাজাকে বিরক্ত করলে তার মুন্ডু ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে এ কথা রাজ অলিন্দের টিকটিকিও জানে। যার জন্য বীরচন্দ্র মানাঘরে ঢুকলে টিকটিকিও টিক টিক করতে ভুলে যায়।

যদিও মদন মিত্র জানেন, মানা ঘরে ঢুকতে তাঁর মানা নেই তবু তিনি বুঝতে পারছেন না এ সময়ে মানাঘরে ঢুকে মহারাজকে বিরক্ত করাটা সমীচীন হবে কি না। মদন মিত্র গত দু'দিন ধরে খুবই মনোকষ্টে আছেন। তাঁর প্রায়ই মনে হচ্ছে, মহারাজাকে বিষয়টা জানানো দরকার। আর দেরী করাটা ঠিক হবে না। অবশ্য বীরচন্দ্রকে জানিয়েই যে কি হবে কে জানে। রাজা মহারাজার ব্যাপার । হয়ত ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, হয়ত পাত্তাই দিলেন না। মদন মিত্র ছাপোষা মানুষ, মহারাজাদের মতিগতি বোঝা তার পক্ষে সত্যি দুষ্কর। ইদানীং বীরচন্দ্রের কান্ড-কারখানা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মুখে বলছেন এটা করবেন সেটা করবেন, আর কাজ করবেন ঠিক উল্টোটা। অনেকসময় দরবারে বসে পরামর্শদাতাদের সঙ্গে পরামর্শের ভাব

করছেন অথচ পরে কার্যত করছেন নিজের মনে আছে যা তাই। কেউ আগে ঘূণাক্ষরে তা টেরও পাচ্ছে না। অন্যেরা না জানলেও মদন মিত্র জানেন, বীরচন্দ্রকে দেখতে ভোলেভালা মনে হলে কি হবে আসলে তিনি হলেন ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এক বিরল ব্যক্তি। যখন কবিতা লেখেন তখন বীরচন্দ্র হলেন সত্যিকারের সহজিয়া কবি আবার যখন সিংহাসনে বসে রাজ্যপাট চালান তখন তিনি একাধারে নিষ্ঠুর এবং উদার। বীরচন্দ্রকে মদন মিত্র যত দেখছেন ততই অবাক হচ্ছেন। একটি রক্তমাংসের মানুষ এত বিপরীত গুণের আধার হন কি করে?

বীরচন্দ্রের কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী ঠিক উল্টো। এমনিতে ভীষণ চাপা। কিন্তু চাপা হলে কি হবে, তাঁর মনের মূক ভাষা বাক্যে প্রস্ফুটিত না হলেও তাঁর মুখ দেখে অবলীলায় পড়ে নেয়া যায়। অনঙ্গমোহিনী বাপের ঠিক বিপরীত। তিনি বয়সে কিশোরী, কিছুই তিনি লুকোছাপা করতে পারেন না। মদন মিত্র বীরচন্দ্রের দরবারে সরকারী সভাকবি আবার বেসরকারীভাবে তিনি অনঙ্গমোহিনীর গৃহশিক্ষকও। মদন মিত্র অনঙ্গমোহিনীকে নিজের কন্যার চেয়েও অধিক ভালোবাসেন। অনঙ্গ তাঁর বাল্য বয়সে চমৎকার কবিতা লিখছেন। বুঝতে কষ্ট হয় না মেয়ে এ বিষয়ে বাপের গুণের উত্তরাধিকার পেয়েছে। অন্যান্য ভাই বোনেরা যেখানে চাওয়া-পাওয়া নিয়ে রাজবাড়ী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে অনঙ্গমোহিনী নীরবে অন্দরমহলের অলিন্দে একটি দুটি কবিতার কুসুম সযত্নে ফুটিয়ে চলেছেন। বীরচন্দ্র বিনা কারণে একদিন মদন মিত্রের মাসোহারা বাড়িয়ে দিয়েছেন যা দরবারে অনেকের শিরঃপীড়া এবং অন্তর্দাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মদন মিত্র নিজেও জানেন না কেন তার মাসোহারা বাড়লো। সেদিন আড়ালে বীরচন্দ্র মদন মিত্রের কাঁধে হাত রেখে বলেছেন, মদন মেয়েটা কবিতা-টবিতা লেখে। তুমি একটু ওর ছন্দ যতিগুলো দেখে দিয়ো। আমার কুষ্মান্ড পুত্ররা তো আমাকে ডোবাবে। সে আমি জানি। এখন অনঙ্গ যদি বাপের নাম রাখে তাহলেই আমি স্বর্গে গিয়ে শান্তি পাবো। অনঙ্গের কবিতা যত ভালো হবে ততো তোমার মাইনে বাড়বে। দরবারের পাঁচ কথায় কান দিয়ো না, তুমি তোমার কাজ করে যাও। আমি মাঝে মধ্যে পরীক্ষা নেব, বুঝলে মদন আমার!

অনঙ্গমোহিনী আজকাল আর কবিতা লিখছেন না। তাঁর মন খারাপ, তিনি কেবল উদাস হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছেন। সবকিছু তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে। একেবারে কবিতা লেখা বন্ধ করার আগে রাজকুমারী যে দু'একটা কবিতা লিখেছেন সেগুলো কেবল হতাশা আর বেদনায় ভরা। মদন মিত্র সে কবিতাগুলো পড়েছেন। তাতে তাঁর মনে হয়েছে অনঙ্গমোহিনী সম্ভবতঃ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোন এক গুরুতর সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন। কী সে সংকট মদন মিত্র জানেন না। তবে তিনি এটা জানেন, তাঁর নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় কন্যাসম রাজকুমারীর কোন অনিষ্ট হোক তা তিনি হতে দেবেন না। মহারাজা বীরচন্দ্রের অনেক স্ত্রী অনেক ছেলেমেয়ে, কার কি হচ্ছে তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মদন মিত্র আজ মরিয়া হয়ে উঠেছেন, মহারাজাকে রাজকুমারীর কবিতা লেখা বন্ধ করার ব্যাপারটা জানানো উচিত। এমনিতে দেরী হয়ে গিয়েছে, আর দেরী করা ঠিক হবে না। বীরচন্দ্রকে অনঙ্গমোহিনীর ব্যাপারটি নিভৃতে জানানোর জন্য মদন মিত্র বারকয়েক চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। বীরচন্দ্রকে

একা পাওয়া যাচ্ছে না । কেউ না কেউ তাঁকে সবসময় ঘিরে থাকছে। তাই অগত্যা মানা ঘরের সামনে এখন এসে দাঁড়িয়ে আছেন মদন মিত্র। ভেতরে চুড়ির টুং টাং শাড়ীর খসখসানি শোনা গেল। কে যেন চকিতে লঘু পদশব্দ তুলে অন্দরমহলের দিকে চলে গেল। ক্রোধান্বিত বীরচন্দ্র সশব্দে দরজা খুলে মদন মিত্রকে দেখে আরও রাগের ভান করে বললেন, রে মদন মিত্র। আজকে তোমাকে আমি মদনভস্ম করবো।

মদন মিত্র নিরক্ত হাসি হাসলেন। তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। কে জানে সত্যি হয়ত মহারাজা রেগে গিয়েছেন। কিন্তু হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে বীরচন্দ্র বললেন, আজকে তোমার বরাত ভালো, তাই বেঁচে গেলে। নইলে তোমার সভাকবির চাকুরীটা তো যেতো আর মুন্ডুটাও যেতো । তোমার চৌদ্দ পুরুষের বাবাও তোমাকে বাঁচাতে পারতো না।

বীরচন্দ্র এগিয়ে এসে মদন মিত্রের পেটে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা মেরে বললেন, আজকে তুমি না জেনে এক দারুণ কাজ করেছো হে। মানা ঘরের ভেতরে মনোমোহিনীর বিভিন্ন পোজের ছবি তুলছিলাম। ছবিগুলো শুধু ছবিই হচ্ছিল, কোনটাতে প্রাণ ছিল না। সবই কাঠ কাঠ নিষ্প্রাণ ছবি। তুমি যখন বাইরে ছটফট করছিলে, মনোমোহিনী শরমে রাঙ্গা হয়ে বনহরিণীর মত ত্রস্ত পায়ে পালিয়ে গেল, আমি ক্যামেরার ল্যান্সে সেই মুহূর্তটিকে ধরে ফেলেছি হে। তোমাকে পরে ডেভেলপ করে দেখাবো। তুমি তো আবার সাত্ত্বিক বৈষ্ণব, সেই ছবি দেখার আগে লজ্জায় চোখ বুজে ফেলবে। তোমাকে নিয়ে জ্বালা। তোমাকে তো কতদিন বলেছি, সৌন্দর্য হল উপভোগ করার জিনিষ। নারী হল সৌন্দর্যশ্রেষ্ঠ। ভোগে কোনো পাপ নেই।

মদন মিত্র বীরচন্দ্রের কথা শুনে লম্বা জিভ বের করে তাতে কামড় দিলেন। বীরচন্দ্র তাঁর কাঁধে একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় মেরে বললেন, তোমার নাম কে রেখেছে মদন ? তুমি তোমার নামের অযোগ্য।

বীরচন্দ্র কলিজা খুলে হাসতে লাগলেন হা হা করে। হাসি থামলে সবিনয়ে মদন মিত্র বললেন, মহারাজ, আপনাকে একটা জিনিষ জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আপনি যদি সাহস দেন তো নির্ভয়ে বলি, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী ইদানীং কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। মনে হয় তাঁর মনে গভীর কোন কষ্ট। তাঁর চোখ মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

বীরচন্দ্র মৃদু হেসে সব উড়িয়ে দিয়ে বললেন, অনঙ্গ তো ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হবেই, তাঁরই বাপের রোগ সে পেয়েছে। আমার মত অনঙ্গের রক্ত আমাশা তা তুমি জানো না। রাজবদ্যি বলেছে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যোদয়ের আগে থানকুনি পাতা বেটে রস খেতে।

বারান্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বীরচন্দ্র হঠাৎ মদন মিত্রকে প্রশ্ন করলেন, আমার অবশ্যি কোনোদিনই রক্ত আমাশা সারবে না। কেন বল তো ?

মদন মিত্র সাহসে ভর করে বললেন, আপনি এতো অনিয়ম করেন যে আপনার তো না সারারই কথা ।

তোমার মাথা ! বীরচন্দ্র মৃদু তিরস্কার করে বললেন, রাজবদ্যি বলেছে সূর্য ওঠার পরে থানকুনি বাটা খেলে নাকি কোন গুণ নেই। আর আমার ঘুমই ভাঙ্গে সূর্যের আলো দেখলে পরে। আমার আর রক্ত আমাশা সারবে কি করে বল। একদিন রাজবদ্যিকে বেটে খেয়ে ফেলবো তাহলে যদি সারে।

মদন মিত্র প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য আমতা আমতা করে বললেন, রাজকুমারীর ব্যাপারটা একটু অন্য ধরনের। আপনি খোঁজ করে দেখুন।

মুহূর্তের মধ্যে বীরচন্দ্রের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তিনি কণ্ঠস্বর বদলে ফেললেন তৎক্ষণাৎ। হাল্কা লঘু সুরের জায়গায় গম্ভীর ভাব এনে বললেন, একটু অন্য ধরনের মানে? তুমি কি বলতে চাইছো ?

মদন মিত্র ঢোঁক গিলে বললেন, আমার মনে হয় রাজকুমারীর এখন বিয়ে দেওয়া দরকার। বিয়ে হলে অনঙ্গমোহিনীর হতাশা, বেদনা এবং রক্ত আমাশা সব সেরে যাবে।

বীরচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তাই নাকি? আমি তো অনেক বিয়ে করেছি কই আমার তো রক্ত আমাশা সারছে না।

মদন মিত্র বুঝলেন বীরচন্দ্র আজ দারুণ খোসমেজাজে আছেন। মহারাণী মনোমোহিনীর ছবি তুলে তিনি নিজেই আহ্লাদে বিগলিত। আজ তাঁকে কিছু বোঝানো যাবে না।

কিছুক্ষণ বাদে মহারাজার পার্শ্বচর এবং দেহরক্ষী মহিম দেববর্মণ ঢুকলে মদন মিত্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আমি তাহলে উঠি, মহারাজ।

ভারক্রান্ত মনে নতমুখে হেঁটে দরজার কাছাকাছি চলে যাওয়ার পর হঠাৎ বীরচন্দ্র মদন মিত্রকে পিছু ডাকলেন। আনমনা হয়ে বললেন, মদন, তুমি কবি মানুষ। রাজকুমারীর কবিতার দিকটাই তুমি দেখো। অনঙ্গমোহিনীর বিয়ের ব্যাপারটা তুমি ভাবতে যেয়ো না। রাজা-মহারাজার কান্ড তো ! মাঝখানে তুমি বে-ইজ্জত হবে। চাকুরীটা চলে যাবে তোমার। আমিও তোমাকে বাঁচাতে পারব না। বীরচন্দ্র অমুক বীরচন্দ্র তমুক লোকে বললেও তুমি তো জানো আমি কত অসহায়। তুমি তোমার ভালো দেখো, অনঙ্গের ভালো ঠাকুর দেখবেন।

বীরচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। মদন মিত্রের কাছে সমস্ত ঘটনাটি কেমন যেন যোগসূত্রহীন হেঁয়ালির মত মনে হল। মহারাজাকে এরকম ভেঙ্গে পড়ে বিধ্বস্ত হতে দেখেননি আগে কোনদিন।

অবশ্য বীরচন্দ্র মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে মহিমের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে উঠে বললেন, হারামজাদা, হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন ? যা, যেখান থেকে পারিস সমরেন্দ্রকে ধরে নিয়ে আয়। আমি আজ চাবকে তার পিঠের ছাল তুলে নেব।

দুই

বীরচন্দ্রের তিন পাটরাণী—ভানুমতী, রাজরাজেশ্বরী এবং মনোমোহিনী। মেজ ঈশ্বরী রাজরাজেশ্বরীর পুত্র হলেন রাধাকিশোর আর কন্যারা হলেন অনঙ্গমোহিনী আর জয়মঙ্গলা। অনেক পরে বড় ঈশ্বরী ভানুমতীর পুত্র সন্তান জন্মাল তিনি হলেন সমরেন্দ্র। বীরচন্দ্রের অবর্তমানে কে রাজা হবেন এ নিয়ে রাজপ্রাসাদে সমরেন্দ্রর জন্মের পর থেকেই জল্পনা-কল্পনা। রাধাকিশোর সবার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কিন্তু মাতৃসূত্রে সিংহাসনের একনম্বর দাবিদার নন। আবার সমরেন্দ্রর দাবী পহেলা নম্বর হয়েও নয় কেননা সমরেন্দ্র জন্মেছেন পরে। বীরচন্দ্র ইদানীং তাই ভানুমতী আর রাজরাজেশ্বরীকে এড়িয়ে যুবতী ভার্যা মনোমোহিনীকে নিয়ে মানা ঘরে নারীর সৌন্দর্য নতুন করে আবিষ্কার করার খেলায় মেতে আছেন।

মানা ঘরে তাঁর সময় কাটলেও বীরচন্দ্র অন্যান্য খবর যে রাখছেন না এটা ঠিক না। রাজ্যপাটকে তিনি এড়িয়ে থাকতে চাইলেও রাজ্যপাট তাঁকে এড়িয়ে থাকতে দিতে চায় না। ভানুমতীর আসকারা পেয়ে আর রাজদরবারের কিছু স্তাবকের স্তাবকতায় সমরেন্দ্রর মুণ্ডুটা ইদানীং ঘুরে গিয়েছে এ খবর বীরচন্দ্র রাখেন। দিন দিন সমরেন্দ্র দুর্বিনীত হয়ে উঠছেন। সমরেন্দ্র ধরে নিয়েছেন তিনি রাজা হবেন, তাঁকে আর আটকানোর কেউ নেই। বাবা বীরচন্দ্রকেও তিনি থোড়াই তোয়াক্কা করছেন আজকাল।

রাজদরবারের প্রবীণ সদস্য রাধারমণ ঘোষ, যিনি কয়েকদিন আগে কলকাতায় গিয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের রবিবাবু নামে এক তরুণ কবিকে বীরচন্দ্রের হয়ে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছেন, এহেন মান্যগণ্য লোককে সমরেন্দ্র সেদিন বেত দিয়ে মারতে গিয়েছিলেন। রাধারমণ ঘোষ রাজবাড়ীর গৃহশিক্ষক, বীরচন্দ্র নিজেও তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। রাধারমণকে চাবকানোর সময় সামনে ছিলেন দেওয়ান হরচরণ নন্দী। দেওয়ান বাধা দিতে এলে সমরেন্দ্র তাঁকেও কয়েক ঘা বসাতে কসুর করেননি। রাধারমণ এবং হরচরণ ছুটতে ছুটতে এসে বীরচন্দ্রের কাছে আশ্রয় নেন। বীরচন্দ্র চোখের সামনে মানীর মানহানি দেখেছেন অসহায়ের মত। সমরেন্দ্রকে কোন শাস্তি দিতে পারেননি। বস্তুতপক্ষে তিনি পুত্রস্নেহে অন্ধ নন, তবু কিছু করতে পারছেন না শুধু টলটলায়মান সিংহাসনের পানে তাকিয়ে। বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি আর সতীনে সতীনে চুলোচুলি করে সবই খোয়াবে কিনা কে জানে।

সমরেন্দ্র সম্পর্কে তিনি কি করবেন বীরচন্দ্র মনে মনে ছক করে রেখেছেন। কাউকে তিনি ঘুণাক্ষরেও তা বলেননি। কখনো বলবেনও না। শুধু সময়ে লোকে জানবে। কিন্তু এখন বীরচন্দ্রের কষ্টে বুক ভেঙে যাচ্ছে। রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, যে কিনা কারোর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, সেই রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনীর জীবনেও সমরেন্দ্রর উপস্থিতি টের পেয়ে। মদন মিত্র যখন অনঙ্গের বিয়ের কথা বলছেন, বীরচন্দ্র হাসিঠাট্টা করে লঘু করে দিয়েছেন। মদন মিত্রকে বিদায় করে দিয়ে বলেছেন, তুমি তোমার ভালো দেখো, অনঙ্গের ভালো ঠাকুর দেখবেন। সংগে সংগে মহিমকে ধমকে বলেছেন, সমরেন্দ্রকে ধরে

নিয়ে আয় । আমি আজ চাবকে তার পিঠের ছাল তুলে নেব ।

এটা আসলে কথার কথা । সবাই জানে, মহিম তো জানেনই । পিঠের ছাল তোলা তো দূরের কথা, সমরেন্দ্রকে ডাকতেই কেউ সাহসী হবে না ।

দিনকয় বাদে সমরেন্দ্র নিজেই রাণীরবাজার পেরিয়ে নতুন হাবেলিতে এসে সরাসরি বীরচন্দ্রের কাছে চলে এলেন । এসে কোন ভণিতা না করেই বললেন, বাবা, শুনলাম আপনি নাকি আমার পিঠের ছাল চাবকে তুলে নেবেন । আমি নিজেই এসেছি, এই নিন ছাল তুলুন।

বলে একটানে সাটিনের আজানুলম্বিত জোব্বাটি ছিঁড়ে ফেলে উদোম পিঠটা বীরচন্দ্রের দিকে ফিরিয়ে রেখে সমরেন্দ্র মিটিমিটি হাসতে লাগলেন । বীরচন্দ্র পুত্রের ঔদ্ধত্য এবং হঠকারিতায় ভীষণ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন ।

অশক্ত মানুষের মত এলিয়ে পড়ে বীরচন্দ্র বিড়বিড় করে জিগ্যেস করলেন, তুই রাজমন্ত্রী ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মার ভাইপোকে মেরেছিস কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সমরেন্দ্র পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তাকে মেরেছি এ কথা আপনাকে কে বলল ?

বীরচন্দ্র দাঁতে দাঁত ঘষলেন । ধৈর্যেরও সীমা আছে । একবার মনে হল চীৎকার করে বলেন, মহিম ! বন্দুকটা নিয়ে আয় । আজ নিজের ছেলেকে মেরে পুত্রহন্তা হই । তবু লোকে জানুক বীরচন্দ্র বীর, কাপুরুষ নয় ।

পরমুহূর্তেই বীরচন্দ্র কেমন যেন অবসাদে মিইয়ে গেলেন । সমরেন্দ্র বাবার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ধমকের সুরে বললেন, আমি সব জানি । অনঙ্গমোহিনীর মাস্টার মদন মিত্র আপনাকে সব বলে আমার নামে কান ভারি করেছে । বাবা, আপনাকে একটা কথা বলি, এমন শাস্তি আমি মদন মিত্রকে একদিন দেব যেন জন্মের মত তার কীর্তনের সাধ ঘুচে যায়।

দপ করে জ্বলে উঠলেন বীরচন্দ্র । চীৎকার করে বললেন, তুই একবার মদন মিত্রের গায়ে হাত তুলে দেখ, আমি তোর দু'হাত কেটে নেব রে, পয়মাল ।

সমরেন্দ্র চারদিকে তাকিয়ে বুড়ো বাপকে ভেংচি কেটে যেমনি এসেছিলেন তেমনি অবহেলায় তুড়ি মেরে আবার বেরিয়ে গেলেন ।

বীরচন্দ্র গ্লানিতে ম্রিয়মান হয়ে মরমে মরে যাচ্ছিলেন । মহিমকে ডেকে বললেন, মহিম, জোগাড়যন্ত্র কর আমি আর এখানে থাকব না । বৃন্দাবন চলে যাব ।

তিন

নতুন হাবেলি এবং পুরানো আগরতলার লোকজন অবাক হয়ে শুনল এব অদ্ভুত রাজাদেশ। রাজাদেশটি হল রাজধানীতে উচ্চৈঃস্বরে অশ্লীল গান গাওয়া নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে । আদেশটি

আগেই ছিল তবে অনেকেই জানত না। আর যারা জানত তারাও সম্ভবত ভুলে গিয়েছিল। নতুন করে নিষেধাজ্ঞাটি প্রচারিত হলে সবাই ভীষণ ভড়কে গেল। কেউ কেউ মুচকি হাসল। 'রোবকারি কাছারি খাস আপিল আদালত এলাকে রাজগী পর্ব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা অধিবেশিত শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায় বিচারক' হুকুমনামা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জারি করলেন ঃ

"নতুন হাবেলি ও পুরান আগরতলায় রাজবাটী ও ঠাকুরলোক ও অন্যান্য ভদ্রলোক ও গৃহস্থলোক বাড়ীর এবং বাসার নিকট কোন রাস্তায় রাত্রিতে কি দিবাতে যে কোন সময় কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কোন প্রকারের অশ্লীল গাহান উচ্চৈস্বরে করিয়া গমন না করার পক্ষে নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রচার করা আবশ্যক। এতাবেতা

হুকুম হইল যে

সর্বসাধারণের জ্ঞাপন জন্য ঘোষণা দ্বারা নূতন হাবেলি ও আগরতলার বাজারে ও অন্যান্য স্থানে উপরোক্ত মর্মে নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রচারার্থ অত্র রোবকারীর একখণ্ড প্রতিলিপি অধস্থ ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করা যায়। প্রকাশ থাকে যে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হওয়ার পর কোন ব্যক্তি ঐরূপ স্থানে অশ্লীল গাহান ইত্যাদি করা প্রকাশ হইলে ঐ ব্যক্তি ১৫ পনের দিবসের অনধিক কাল শ্রম কি বিনা শ্রমে কোন একপ্রকার কয়েদ ও ১০ দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক। ইতি"

রাজাদেশটি প্রচারিত হওয়ার পর কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের একখণ্ড পাওয়ার জন্য আগরতলায় গোপনে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীল কি গান আছে যা গাইলে পনের দিনের কয়েদ এবং দশ টাকা অর্থদণ্ড হতে পারে জানার জন্য মদন মিত্র লুকিয়ে ভারতচন্দ্রের ঐ বইটির একটি সুলভ সংস্করণ জোগাড় করলেন। পুস্তকটির কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টোতে গিয়ে মদন মিত্রের চোখ মুখ কান লাল হয়ে গেল। তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি কয়েকটি পংক্তি পড়ে ফেললেন—

দংশয়ে পতির অধর দলে।
কপোত কোকিলা কুহরে গলে।।
উথলিল কামরস জলধি।
কত মত সুখ নাহি অবধি।।
ঘন ঘন ভুরু কামান টানে।
জর জর করে কটাক্ষ বাণে।।
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে।
অধীরা হইয়া অধর চাপে।।

এইটুকু পড়ে মদন মিত্র বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি কাঁপা কাঁপা হাতে বন্ধ করে রাখলেন। কবি হিসেবে ভারতচন্দ্রের বেশ নাম হয়েছে। কিন্তু তিনি এত নীচু এবং অশ্লীল গান লিখতে পারেন মদন মিত্র কল্পনাও করতে পারেন না। ভারতচন্দ্র কেন, কোনো ভদ্রলোক সাদা

কাগজের পাতায় কালিতে এরকম অমার্জিত কুরুচিপূর্ণ পংক্তি কি করে লিখবার বা ভাব প্রকাশ করবার প্রেরণা পান সেটাও তাঁর বুদ্ধির অগম্য বিষয়।

হঠাৎ দরজায় চোখ পড়তেই মদন মিত্র ভীষণ চমকে উঠলেন । রাজমন্ত্রী ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মা দীর্ঘ ছায়া ফেলে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন । বিমর্ষ ধনঞ্জয় দেববর্মা এগিয়ে এসে নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসলেন । তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মদনবাবু, আপনি কি জানেন আমার ভাইপোর পনের দিনের হাজতবাস হয়েছে আর দশ টাকা জরিমানা, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল গান গাওয়ার জন্য । আমি নিজে রাজমন্ত্রী হয়েও তাকে বাঁচাতে পারলাম না। এটা আমার দুঃখ ।

মদন মিত্র ধনঞ্জয় দেববর্মার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মোটামুটি চেনেন। ছেলেটি ভালো, সুদর্শন এবং রুচিবান। লুকিয়ে কবিতা-টবিতা লেখে। মদন মিত্রের কাছে তার স্বরচিত কয়েকটা কবিতা দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অনঙ্গমোহিনীর কবিতার মত তারও লেখার হাত খুবই ঝরঝরে এবং প্রতিশ্রুতিময়। মদন মিত্র রাজকুমারী অনঙ্গকে তার বেশ কয়েকটা কবিতা পড়তে দিয়েছেন। অনঙ্গমোহিনী ধনঞ্জয় দেববর্মার ভাইপোর কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। তাকে অশ্লীল গান গাইবার অপরাধে হাজতে যেতে হয়েছে— তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাছাড়া অবিশ্বাস্য অন্য এক কারণেও, যাকে কয়েদে পাঠানো হয়েছে সে যে-সে নয় খোদ রাজমন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

মদন মিত্রের সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল, তিনি কিছুই হিসেব মেলাতে পারছিলেন না। ধনঞ্জয় দেববর্মা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, আপনি কি জানেন, আমার ভাইপোর হাজতবাসের জন্য আপনি দায়ী ?

মদন মিত্র এবার ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন । ঘামতে লাগলেন । অস্ফুট স্বরে বললেন, আমি দায়ী । মন্ত্রী বাহাদুর, আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ।

ধনঞ্জয় দেববর্মা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললেন, এখন কি করে বুঝবেন; সব তো প্যাঁচ লাগিয়ে বসে আছেন নিজেই । আপনি মহারাজকে বলেননি রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী আজকাল আর কবিতা লিখছেন না । তাঁর একটা বিয়ে দেয়া দরকার । ঠিক কিনা ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ । মদন মিত্র ঢোঁক গিলে বললেন ।

আপনি কি জানেন, রাজকুমার সমরেন্দ্র আমার ভাইপোকে একদিন পিটিয়ে হাড্ডি গুঁড়ো করে দিয়েছে ? কেন পেটাল বলুন তো ?

আজ্ঞে তা তো জানি না । মদন মিত্র নির্দোষ কণ্ঠে বললেন ।

রাজমন্ত্রী মৃদু তিরস্কার করে বললেন, মহারাজা ভেবেছেন আপনি অনঙ্গমোহিনীর সঙ্গে আমার ভাইপোর বিয়ের ঘটকালী করতে চান, তাদের দুজনের মধ্যে কবিতার প্রেমপত্র চালাচালি কারার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনি। রাজকুমারীর প্রেমিককে সমরেন্দ্র বরদাস্ত করতে পারে নি, তাই তাকে পিটিয়েছে । বুঝলেন ? সমরেন্দ্র বলে বেড়াচ্ছে এখন নাকি

আপনাকে পেটাবে। আপনি কবি মানুষ, কীর্তন নিয়ে থাকেন, খোল করতাল বাজান, আপনি কেন রাজা মহারাজাদের পারিবারিক সব ব্যাপারে নাক গলাতে যান, অ্যাঁ !

মদন মিত্র সবকিছু শুনে রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। তিনি বুঝি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন এখন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে মদন মিত্র বললেন, মন্ত্রী বাহাদুর, তাহলে আমি এখন কি করব? আমার এখন কি করণীয় ?

কি আর করবেন ? যা ক্ষতি হবার তো হয়েই গেল। আমার ভাইপোকে হাজতবাস করিয়ে কুমিল্লার কাছে একটা তালুক উপঢৌকন দিয়ে এ দেশ থেকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। সমরেন্দ্র চটে গিয়েছিল, তাকে খুশী করা গেল। আর কদিনের মধ্যেই ধুমধাম করে উজীর বংশের ঠাকুর শিবজয়ের ছেলে গোপীকৃষ্ণের সঙ্গে রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনীর বিয়ে সম্পন্ন হবে। কিছু বুঝতে পারলেন, শিবজয়ের সঙ্গে রাজপরিবারের মামলা মোকদ্দমা চলছে। তাঁর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে।

রাজমন্ত্রী চলে যাবার আগে নিচু গলায় ফিসফিস করে বললেন, মহারাজা বীরচন্দ্র যে কি ধাতুতে গড়া তা শিবের অসাধ্য জানা। এতবড় কান্ড হল কেউ জানতেই পারল না। এক ফোঁটা রক্তপাত হল না অথচ অপারেশান সাকসেসফুল।

চার

সুন্দর সুপ্রভাত। চারদিকে ঝলমলে রোদ। বীরচন্দ্র সাত সকালে মদন মিত্রকে ডেকে পাঠালেন। মহারাজা আজ খুবই খোশমেজাজে আছেন দেখলেই বোঝা যায়। মদন মিত্রকে দেখেই রঙ্গ করে বললেন, কি হে মদন কুমার ! অনেকদিন ধরে তোমার টিকির সন্ধান পাচ্ছি না কেন ?

তারপর মৃদু হেসে বীরচন্দ্র বললেন, রাজকুমারীর কবিতা লেখা কেমন চলছে ?

সত্যি কথা বলতে কি রাজমন্ত্রী ধনঞ্জয় দেববর্মার ভ্রাতুষ্পুত্রের অহেতুক হাজতবাস এবং রাজকুমার সমরেন্দ্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে নির্বাসনে পাঠানো, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনীর গোপীকষ্ণের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া পরপর ঘটনাগুলোর আকস্মিকতায় মদন মিত্র খুবই কাবু হয়ে পড়েছিলেন। আগরতলার রাজপ্রাসাদের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে যাওয়ার জন্য মোটামুটি নিজেকে মনের দিক থেকে তৈরী করে নিয়েছিলেন। অনঙ্গমোহিনীর কবিতা লেখার বিষয়ে মদন মিত্রের আগ্রহ এবং উৎসাহ আর আগের মত নেই। মদন মিত্র হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন— রাজায় রাজায় ঝগড়া এবং তাতে উলুখাগড়ার প্রাণ যায় কথাটা কত নির্মম সত্যি। ঘটনাগুলো ঘটল এমনভাবে তাতে মদন মিত্র দায়ী হয়ে রইলেন, অথচ কোন কিছুতেই তাঁর কোনো হাত বা স্বার্থ নেই।

বীরচন্দ্র মদন মিত্রের তন্ময় ভাব ভেঙে দিয়ে ফের বললেন, কি হলো । কিছু বলছো না যে? অনঙ্গের কবিতা লেখা কেমন চলছে ? কি ভাবছো ?

কিছুটা অভিমান কিছুটা বেদনায় আহত হয়ে মদন মিত্র বললেন, মহারাজ, আমি কলকাতায় ফিরে যেতে চাই ।

সে কি ? বীরচন্দ্র সিংহাসন থেকে উঠে এসে মদন মিত্রের কাঁধে হাত রেখে পরম বন্ধুর মত সস্নেহে বললেন, অত অল্পতেই ভেঙে পড়লে চলে ? আমি জানি তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছো, কেন এখান থেকে চলে যেতে চাও। আমার ওপর তোমার রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে, তাও আমি জানি। তবে শোনো তোমাকে একটা কথা বলি, সব ঠিক হয়ে যাবে । জামাই গোপীকৃষ্ণ খুব ভালো ছেলে । অনঙ্গমোহিনী আবার কবিতা লিখতে শুরু করেছে। এই দেখো কি চমৎকার কবিতা লিখেছে অনঙ্গমোহিনী।

বীরচন্দ্র পকেট থেকে অনঙ্গমোহিনীর সদ্য লেখা একটা কবিতা বের করে মদন মিত্রের হাতে তুলে দিলেন । কবিতাটির নাম "অভিজ্ঞান" তার প্রথম আটটি পংক্তি হল —

দিয়েছ যে অভিজ্ঞান
মনে রাখিবারে,
'মনে রেখো' রেখাঙ্কিত
সুন্দর অঙ্গুরী ।
কিন্তু তা হতেও আরো
উজল আখরে
হৃদে আছে আঁকা তব
মুরতি মাধুরী ।

কবিতাটি পড়তে পড়তে মদন মিত্রের এক অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে মন ভরে গেল । অনঙ্গমোহিনীর কবি প্রতিভার বিচ্ছুরণে তিনি বিমুগ্ধ । মনের সব গ্লানি ধুয়েমুছে গেলেও মদন মিত্র কলকাতায় ফিরে যেতে অনড় হয়ে থাকলেন ।

কলকাতায় চলে এলেও মদন মিত্র আগরতলার সঙ্গে সবসময়েই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছেন। অনঙ্গমোহিনী যখন যখন কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন মদন মিত্র সেগুলো যত্ন করে পড়েছেন । সাধ্যমত নিজের সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে পত্রোত্তর দিয়েছেন । মহারাজা বীরচন্দ্রের সাথেও মদন মিত্রের সখ্যতা এবং যোগাযোগ সব সময়ই ছিল । সেবার কলকাতার ত্রিপুরা হাউসে বীরচন্দ্র এসে সপারিষদ ক'দিন ধরে আছেন । কার্সিয়াং যাবার তোড়জোড় হচ্ছে । অল্পস্বল্প নামধাম হয়েছে সেই তরুণ কবিবর রবিবাবুকে ডেকে এনেছেন বীরচন্দ্র । সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে রাজা এবং কবি আলোচনায় মশগুল । মদন মিত্রও সেই আসরে উপস্থিত।

হঠাৎ বীরচন্দ্র একটি দীর্ঘ কবিতার সুছাঁদ হরফে লেখা পাণ্ডুলিপি রবিবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আচ্ছা, এই কবিতাটি পড়ে বলুন তো এটা কেমন কবিতা হয়েছে ?

রবিবাবু কবিতাটিতে দৃষ্টি বুলাতে বুলাতে বললেন, এ কবিতাটি কার লেখা ?

বীরচন্দ্র রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, কে লিখেছে পরে বলব। আগে আপনার মতামতটা শুনি। আপনি কবি— আপনিই ভালো বুঝতে পারবেন এটি আদৌ কবিতা হয়েছে নাকি শুধুই কিছু প্রাণের আবেগ। রবিবাবু বৈঠকী আসরে লঘু আবহাওয়ায় কবিতাটি অগভীর ভাবে পড়তে গিয়ে ভীষণ হোঁচট খেলেন। প্রথমে গুনগুন করে পরে গুরুগম্ভীর গলায় রবিবাবু আবিষ্টের মত কবিতাটি ভাবাবেগ দিয়ে আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন —

বিরহ

সখি, আর কত দিন সুখ শান্তিহীন
বিষাদিত মন সনে,
আমি রহিব গো বল এ গোকুল মাঝে
দারুণ ব্যথিত প্রাণে।

* *

সে যে আসিবে বলিয়ে গেছে গো চলিয়ে
আসিবে সে আর কবে,
সখি, আসিবে গো বুঝি এ জীবন ফুল
ঝরিয়া যাইবে যবে।

* *

আসরে এক অবর্ণনীয় নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। একে অন্যের পানে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। সবার মনে এক প্রশ্ন— কে এই কবি? হৃদয় নিংড়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে এরকম অনবদ্য অনুপম কবিতা লিখেছেন ? রবিবাবু কবিতাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। শেষের লাইন রবিবাবু দু'দুবার করে পড়লেন --

তবে যাই গো সজনি আকুল হৃদয়
জুড়াইতে চিরতরে,
আজি সজনি লো মম পিয়াসিত প্রাণ
মিশাব যমুনা নীরে।

কবিতাপাঠ শেষ হবার পরও তার বিবশ অনুরণন সারা বৈঠকখানায় ছড়িয়ে রইল। রবিবাবু বললেন, আমি জানি না এ কবিতাটি কার লেখা। তবে কলকাতার কোন কবি তিনি নন। তাহলে আমি লেখা পড়ে বুঝতে পারতাম। কবিতাটি পড়ে আমার মনে হয়েছে কবি তাঁর নিজের জীবনের ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনাকেই অসীম দরদ দিয়ে ছন্দের বাঁধনে মূর্ত রূপ দিয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে এরকম দরদ দেয়া কবিতা কখনও লেখা যায় না বলে আমার বিশ্বাস।

তারপর বীরচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রবিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, নিন এবার বলুন।

কে লিখেছেন কবিতাটি ? আপনি লেখেন নি তো ?

বীরচন্দ্র একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না, আমি লিখি নি। তবে যে লিখেছে তার মধ্যে বইছে আমারই রক্ত। সে আমার কন্যা অনঙ্গমোহিনী।

রবিবাবু বললেন, আপনার মেয়ে এত দুর্দান্ত কবিতা লেখেন আগে জানতাম না। কেউ বলেনি তো আমাকে। এর কবিতায় একটা স্বাভাবিক কবিত্বের সৌরভ অনুভব করা যায়। কবিতাটির সৌন্দর্য বড় সরল এবং সুকুমার। আর কবির ভাষা এবং ছন্দের ওপর তাঁর নৈপুণ্য একেবারে সাবলীল ও সহজসিদ্ধ।

ঘরের এককোণে বসেছিলেন মদন মিত্র। তিনি প্রথম থেকে নীরব শ্রোতার মত শুনে যাচ্ছিলেন। কখনই কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ করছিলেন না। অনঙ্গমোহিনীর বিরহ কবিতাটির ওপর রবিবাবুর মন্তব্য শুনে তিনি খুবই বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এই কবিতাটি মদন মিত্রের অনুরোধে এবং উৎসাহেই অনঙ্গমোহিনী গোপীভাব অবলম্বনে লিখেছেন। রবিবাবুর মুখে কবি অনঙ্গমোহিনীর কবিতা এবং 'বিরহ'-র স্তুতি শুনে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। আগরতলার পুরনো সব স্মৃতি তাঁকে আবিষ্ট করে ফেলল। আসরের সবাইকে অবাক করে দিয়ে মদন মিত্র হঠাৎ হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলেন।

কাব্যপাঠের আসর হল সুকুমার ব্যাপারস্যাপার। এখানে শব্দ করে কান্নাকাটি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। তবে একেবারে অপরিহার্য হলে চোখে জল চলে আসা পর্যন্ত মেনে নেয়া যেতে পারে, তার বেশি নয়। কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের অভিজাত শিষ্টাচারে দুরস্ত রবিবাবু ভীষণ বিব্রত বোধ করতে আরম্ভ করলেন।

বীরচন্দ্র এসব কিছুর পরোয়া না করে, নিজের আরামকেদারা থেকে উঠে গিয়ে সোজা মদন মিত্রকে টেনে এনে বুকে চেপে ধরে বললেন, ছি মদন, কাঁদে না। ছি।

হে অতীত, কথা কও

এক

আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী, সুতরাং রাজ্যের কোষাগারের অবস্থা শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। ত্রিপুরার পলিটিকেল এজেন্ট মিঃ সি ডব্লিউ বল্টন তাঁর ১৮৭৭-৭৮ ইংরেজী সালের বাৎসরিক রিপোর্টে কড়া ভাষায় মহারাজা বীরচন্দ্রের অমিতব্যয়িতার উল্লেখ করে চিটাগাং ডিভিশনের কমিশনারের কাছে নালিশ করেছেন। বীরচন্দ্র যে রিপোর্টের কথা জানেন না, তা নয়। কিন্তু জানলেও তিনি কিছু করতে পারছেন না। তাছাড়া ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হয় মহারাজার কিছু করার প্রকৃত ইচ্ছেও নেই। রাজবাড়ীর সংসার বিভাগের হিসেব থেকে দেখা যায়, বীরচন্দ্রের ঋণের পরিমাণ মং পাঁচ লক্ষ টাকার অংককেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। যেখানে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের এবছরের রাজস্বের পরিমাণ হল সাকুল্যে এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ টাকা, সেক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা যে-কোন রাজ্যের আর্থিক কাঠামোর পৃষ্ঠকে ন্যুব্জ করার পক্ষে যথেষ্টরও বেশী। বল্টন সাহেব সখেদে তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, মহারাজা বীরচন্দ্র রাজ্য প্রশাসন বিষয়ে মোটেই সময় দিচ্ছেন না। বরং তিনি গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন আমোদপ্রমোদে যার খরচের বহর রাজ্যের পক্ষে বহন করা প্রায় সাধ্যের বাইরে।

রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটা চক্র গড়ে উঠেছে। চক্রটি খুবই ক্ষমতাশালী। অবশ্য মহারাজা বীরচন্দ্রের আস্কারার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সামনে কারোর কিছু বলার বুকের পাটা নেই, কিন্তু আড়ালে এই চক্রটিকে অনেকে গ্যাং অব ফোর বা চারইয়ারি দল বলে ডাকে। মহারাজার শ্যালক নরধ্বজ সিংহ, দুর্যোধনের কর্ণসদৃশ মহারাজা বীরচন্দ্রের সেক্রেটারীবাবু রাধারমণ ঘোষ, সুযোগ্য দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত এবং অনুগৃহীত দেওয়ান হরচরণ নন্দী হলেন এই চারিইয়ারি দলের চারজন। এই চক্রটির ক্ষমতার উৎস হলেন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী দীনবন্ধু ঠাকুর। আবার প্রধানমন্ত্রী দীনবন্ধুর ক্ষমতার উৎস হলেন মহারাজা বীরচন্দ্রের প্রধান

মহিষী ভানুমতী দেবী। অবশ্য লোকে বলে, দীনবন্ধু ঠাকুর প্রধান মহিষী ভানুমতী দেবীকে কি জাদুতে যেন বশ করে ফেলেছেন। দীনবন্ধু যা বলেন, ভানুমতীও তাই বলেন। মহারাজা বীরচন্দ্র খুবই অসহায়। বস্তুতঃ রাজ্যটা চালাচ্ছে এরাই। বীরচন্দ্র সব দেখেও দেখছেন না, বুঝেও বুঝছেন না।

দরবারের সরকারী রাজমন্ত্রী ডাঃ শম্ভুনাথ মুখার্জী অবশ্য ব্যতিক্রম। তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। তিনিই দরবারে একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইংরেজীতে গাঁক গাঁক করে কথা কইতে পারেন এবং ইংরেজীতে চিঠির উত্তর লিখতে পারেন। তাতে এমন মাজরা থাকে যে খোদ সাহেব বাবাজীবনদেরও অর্থোদ্ধারের জন্য ডিকশনারী খুলতে হয়। মুখার্জীকে মহারাজা এজন্য বিশেষ পছন্দ করেন। কিছুদিন আগে কমিশনার সাহেব চিটাগাং থেকে সশরীরে এসেছিলেন আগরতলায়। আনুষ্ঠানিকভাবে সেদিন ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তরফে বীরচন্দ্রকে তিনি মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারাজা খেলাতপ্রদান অনুষ্ঠানে তেরোবার তোপধ্বনি করা হয়েছিল। খুবই জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বরময় অনুষ্ঠান। বীরচন্দ্র মহারাজা উপাধি পেয়ে খুশী। অবশ্য আরও অধিক খুশী হয়েছেন, শম্ভু মুখার্জীর মুখে খই ফোটার মত ইংরেজী বুলি উৎসারিত হতে দেখে। দৃশ্যটা শুধু দেখার নয়, মনে রাখার মত। চিটাগাংয়ের ডিভিশনাল কমিশনার, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি, মিনমিনে গলায় বলছেন, ইয়েস নো ভেরী গুড। আর শম্ভু মুখার্জী একটার পর একটা বোম্‌বাস্টিং ইংলিশ শব্দ কামানোর গোলার মত দেগে যাচ্ছেন। বাঘের বাচ্চা আর কাকে বলে। কিন্তু মহারাজা বীরচন্দ্র খুশী হলে কি হবে, তিনি যতই খুশী শম্ভু মুখার্জীর ওপর ঠিক ততই অখুশী তাঁর ওপর চারইয়ারির দল।

নরধ্বজ সিংহ হলেন মহারাজার সাক্ষাৎ শালা। শালা বলে কথা! সূর্যের চেয়ে বালির তাপ সবসময় বেশী। নরধ্বজ শম্ভু মুখার্জীর ওপর ভীষণ চটে আছেন। চটার কারণটা অবশ্য ইংরেজী নয়, অন্য কিছু। যেখানে ঋণের দায়ে মহারাজা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সেখানে নরধ্বজ তাঁর দিদি ভানুমতীকে সামনে রেখে বীরচন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একটার পর একটা মহাল অল্প জমায় ইজারা নিয়ে গ্রাস করে ফেলছেন। তালুক আর মহাল দখলে কেউই কম যান না। প্রধানমন্ত্রী দীনবন্ধু হাতিয়ে নিয়েছেন দীনবন্ধুনগর, তারানগর এবং লাট কামথানা মহালগুলো। নরধ্বজের ভাগে জুটেছে বনকর খোয়াই ও আরও কয়েকটা তালুক। মহারাণী ভানুমতীকেও এই ভাগ বাটোয়ারায় রাখা হয়েছে। তিনি পেয়েছেন বিশালগড় পরগণা ও আগরতলা পরগণার কিয়দংশ। মহারাণীর ভাগের মহালগুলো উর্বরা এবং লক্ষ্মীমন্ত। রাজ পরিবারের মধ্যে ভানুমতী এখন সবচেয়ে বেশী সম্পদশালিনী এবং ধনাঢ্য রমণী। মহারাজা বীরচন্দ্রের মত ব্যক্তিও মাঝেসাঝে তাঁর কাছে অর্থের জন্য হাত পাতেন। সহকারী রাজমন্ত্রী শম্ভু মুখার্জী মহাল ও তালুক লুটপাটের ব্যাপারটা আটকাতে চেয়েছেন। তাতেই ভীষণ চটেছেন নরধ্বজ এবং প্রধানমন্ত্রী দীনবন্ধু। শম্ভু মুখার্জীকে একটা আস্ত শিক্ষা দেবার অছিলা খুঁজছেন তাঁরা। এমন শিক্ষা তাঁরা মুখার্জীকে দিতে চান যেন শম্ভু বাপের ব্যাটা উঠে চাল আর খুঁটে না খেতে পারে জীবনে।

দুই

রাজবাড়ীর সামনের বিরাট প্রাঙ্গণে শ'য়ে শ'য়ে কাতারে কাতারে মানুষ । এদের মধ্যে কেউ কেউ এসেছে ঢাকা থেকে, কেউ এসেছে বিক্রমপুর থেকে। তবে অধিকাংশ এসেছে মহারাজারই জমিদারী চাকলা- রোশনাবাদের অন্তর্গত লোকালয় থেকে। এরা সব ব্রাহ্মণ। বীরচন্দ্রের আমন্ত্রণে বামুনেরা সব এসেছে । আমন্ত্রণের কারণটি অদ্ভুত । জীবনে কেউ কখনও এমন কান্ড আর আগে শোনেনি। ভবিষ্যতেও শুনবে কিনা সন্দেহ আছে। বীরচন্দ্র হলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । অনেক শাস্ত্র পুঁথিপত্র তাঁর পাঠ করা আছে। ইদানীং তাঁর মনে সংশয় জেগেছে, তিনি হিন্দু কিনা এবং হিন্দু হলে তিনি ক্ষত্রিয় কিনা। তাঁর রাজ্য এবং জমিদারীতে বসবাসকারী প্রজাদের অধিকাংশ হল হিন্দু। প্রজারা তাদের রাজাকে প্রায় দেবতা বলে শ্রদ্ধা সহকারে মান্য করে। দেবতা বলে উপরে উপরে মানা এক কথা আর হিন্দু কুলগৌরব ক্ষত্রিয় বলে মহারাজা বীরচন্দ্রকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করা অন্য কথা। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এব্যাপারে মোটেই স্পষ্ট নয়। বীরচন্দ্রের মনে দুঃখ। প্রধানমন্ত্রী দীনবন্ধু এবং চারইয়ারি দল এ নিয়ে দীর্ঘ শলা করে সিদ্ধান্ত নিল, এ বিষয়ে বড় বড় পন্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞর পরামর্শ নেয়া হবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। প্রধানমন্ত্রী দীনবন্ধু কিছু ভাত ছড়িয়ে দিলেন। ইয়া ইয়া লম্বা টিকিওয়ালা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বায়সরা জুটে গেলেন। তাঁরা বিধান দিলেন— মহারাজা বীরচন্দ্রের স্পর্শ করা জল যদি ব্রাহ্মণেরা পান করে তবেই বীরচন্দ্রের মনের দুঃখ ঘুচবে। তিনি এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা হিন্দু সমাজে ক্ষত্রিয় বলে মান্য হবেন।

বিধান শুনে দীনবন্ধু চোখ টিপলেন। নরধ্বজ পাল্টা চোখ টিপলেন না, তবে মুচকি হাসলেন। এবার এক ঢিলে দুটো পাখি বধ হবার পথ প্রশস্ত হল। বামুনের পো শম্ভুনাথ এবার কী করে—সেটাই দেখার এখন।

বীরচন্দ্রের সম্মতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দীনবন্ধু ঢোল সহরৎ যোগে ত্রিপুরা রাজ্য ও চাকলা রোশনাবাদ জমিদারী এবং তারও বাইরে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে আরও ভাত ছড়িয়ে দিলেন। ঘোষণায় বলা হল, যেসব ব্রাহ্মণেরা রাজার ছুঁয়ে দেয়া জল পান করতে রাজী আছে, তাদের ব্রাহ্মণত্ব খাঁটিত্বের বিচারে যথাক্রমে নগদ মং ছয়শত, চারশত এবং দুইশত টাকা প্রদান করা হবে। তাছাড়া তারা পাবে উপঢৌকন হিসেবে একটি করে পশমী শাল, একটি নধর বাছুর ইত্যাদি। এগুলো হল ব্রাহ্মণদের জাত মেরে দেবার জন্য ধরে দেওয়া মূল্য। এই রোবকারী ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে একদল পড়িমড়ি করে ছুটে চলে এল আগরতলায়। আর অন্য ব্রাহ্মণেরা রাগে ফুঁসতে লাগল। বীরচন্দ্রের এই জাত মেরে দেয়ার ব্যাপারটি তারা মেনে নিতে পারছিল না।

বীরচন্দ্র এবং তাঁর পারিষদদের ছুঁয়ে দেয়া জল হুড়োহুড়ি করে বাংলাদেশ থেকে আগত তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা খেয়ে নিল। অল্প জল খেল তারা। তবে পেটপুরে খেল দই চিড়ে গুড় এবং রসগোল্লা। খাওয়াদাওয়ার শেষে বিরাট ঢেকুর তুলে ট্যাঁকে দক্ষিণা গুঁজে তারা ঘরপানে রওনা হওয়ার জন্য পোঁটলাপুটলি বেঁধে তৈরী হতে লাগল ।

মহারাজা বীরচন্দ্র উঁচু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে দূরের দৃশ্যটি দেখে প্রশান্তিতে ডুব দিলেন। অনেকদিনের মনের বাসনা তার পূর্ণ হল। তিনি এখন উচ্চবর্ণ ক্ষত্রিয়। প্রধানমন্ত্রী দীনবন্ধু এগিয়ে এসে নীচু হয়ে মহারাজার কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বললেন। মহারাজা বীরচন্দ্র গমগমে গলায় হাঁক দিলেন, শম্ভুনাথ, এদিকে সামনে এসো।

সহকারী রাজমন্ত্রী শম্ভুনাথ মুখার্জী সকাল থেকে মহারাজার পাশাপাশিই আছেন। সমস্ত ঘটনার হঠকারী ব্যাপারটি তাঁকে ভীষণ পীড়িত করেছে। তখন থেকেই সারা শরীর চিড়বিড় করছে তাঁর। কিছুই করার নেই, সবই মহারাজার ইচ্ছা এবং মর্জির ওপর নির্ভর করছে।

মহারাজা বীরচন্দ্র বললেন, শম্ভু, তুমি জল খেয়েছো ?

বিনীত উত্তর দিলেন শম্ভুনাথ, না, মহারাজ ।

না। বীরচন্দ্র ক্রোধে জ্বলে উঠলেন ? না, আমার ছুঁয়ে-দেয়া জল খেতে তোমার আপত্তি আছে? দীনবন্ধু আমাকে তাহলে ঠিক বলেছিল, তুমি মুখুয্যের ব্যাটা, খাঁটি ব্রাহ্মণ। তুমি আমাকে সমগোত্রীয় মনে কর না। ভেতরে ভেতরে তুমি আমাকে হ্যাঁটা কর।

মহারাজ, এসব কথা আপনি বলবেন না। কাঁপা কাঁপা গলা শম্ভুনাথ বললেন, মহারাজ, আপনি আমার অন্নদাতা। আমি স্বপ্নের মধ্যেও এসব ভাবতে পারি না।

শম্ভুনাথকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে বীরচন্দ্র বললেন, আমি অতশত ধানাই-পানাই শুনতে চাই না। তুমি বল, আমি জল দিলে তুমি খাবে কি না ? হ্যাঁ, কি না?

মাথা নত করে বীরচন্দ্রের পায়ের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে শম্ভুনাথ বললেন, না।

না শুনে মহারাজা দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। সোজা হয়ে উঠে বসে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, খাবে না, কেন?

শম্ভুনাথ ভয়ডরের ঊর্ধ্বে উঠে বললেন, খাব না এইজন্য যে আমার এখন জলের জন্য তেষ্টা পায়নি। তেষ্টা পেলে আমি চন্ডালের হাত থেকেও জল খেয়ে নেব। আপনার হাত থেকে জল খাওয়া সে তো অশেষ ভাগ্যের কথা । জল খাওয়ানো এক কথা আর জাত মেরে দেওয়া অন্য কথা।

বীরচন্দ্র ক্রোধ দমন করে বললেন, তোমার কি ধারণা, আমি বামুনদের জাত মারছি! তাই যদি হয়, তবে এতসব বামুনেরা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে কেন?

শম্ভুনাথ ফিক করে হেসে ফেলে বললেন, মহারাজ, এরা টাকার লোভে এসেছে। একজন দু'জন দরিদ্র বামুনকে বাদ দিলে এখানে যারা এসেছে এরা কেউই আসল নয়, সবাই নকল। আপনি কারোর কথায় কান না দিয়ে নিজে একবার যাচাই করে দেখুন।

একজন নাদুসনুদুস ভুঁড়িওয়ালা ব্রাহ্মণ সামনে দিয়ে কাছা সামলাতে সামলাতে চলে যাচ্ছিল। এতই দই চিড়া মিষ্টি খেয়েছে যে কোমরের কষি খুলে কাপড় খসে পড়ছে প্রায়। শম্ভুনাথ

তাকে ডেকে মহারাজার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, ও বামুনের ব্যাটা, তুমি আসল না নকল।

লোকটি নিরুত্তর থেকে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। শম্ভুনাথ তখন বললেন, তুমি তো ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী মন্ত্র জানো। মহারাজাকে গায়ত্রী মন্ত্রটা শুনিয়ে দাও তো।

ভয়ে লোকটা তোতলাতে শুরু করল। বলল, গায়ত্রী মন্ত্রটা এখন মনে পড়ছে না।

বীরচন্দ্রের কাছে ধীরে ধীরে সব স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তিনি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলেন। হঠাৎ কি খেয়ালে যেন বীরচন্দ্র সূর্য বন্দনার মন্ত্র আবৃত্তি করলেন সুর করে —

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ ।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ।।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং মন্ত্রটি বীরচন্দ্রের খুব প্রিয়। মন্ত্রটি উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি পুলকিত বোধ করেন । শম্ভুনাথের ধরে আনা বামুনটিকে মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে এক্ষুণি মন্ত্রটি পাঠ করলাম, তাতে দিবাকরের কথা বলা আছে । দিবাকর কে ?

লোকটি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে বলল, আমি দিবাকর বলে কাউকেই চিনি না। আমার নাম সুধাকর।

মহারাজা বীরচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন। লোকটা কাপড়চোপড় নষ্ট করে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে শম্ভুনাথ নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে বীরচন্দ্রের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন, মহারাজ, যেখানে মানীর মান থাকে না, সেখানে চাকুরী করা কঠিন ।

শম্ভুনাথ যাত্রাদলের নাটকের মত তাঁর মাথার শিরোপাটি খুলে মহারাজা বীরচন্দ্রের পায়ের কাছে রেখে রাজবাড়ী থেকে বের হয়ে দীঘির পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। বীরচন্দ্রের মন বিষাদে ভরে গেল । দীনবন্ধু এবং নরধ্বজ খুশীতে ডগমগ। তাঁদের সামনে থেকে শেষ কন্টকটিও উৎপাটিত হয়ে গেল।

তিন

কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরী এবং বিডন স্কোয়ার লিটেরারী ক্লাবের উদ্যোগে এক মহতী সাহিত্যসভার আয়োজন করা হয়েছে। এখানে বিদ্বৎসমাজের অনেক তারকা উপস্থিত আছেন। উপস্থিত হয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি কবি নবীন সেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও দেখা গেল সভাতে। তিনিও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহসভাপতি। নবীন সেন কবি হিসেবে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রবাবুরও অল্পস্বল্প নাম-টাম হয়েছে। সভা শুরু হতে

কিছুক্ষণ বাকি। সভার সভাপতি মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস ব্যানার্জী এখনও এসে পৌঁছুননি।

কবি নবীন সেন তাঁর পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট তরুণ রবিবাবুকে বললেন, শুনেছি আপনার সঙ্গে ত্রিপুরার রাজার যোগাযোগ আছে। ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্রের সঙ্গে আপনি কয়েকদিন কার্সিয়াংয়ে কাটিয়ে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্নিগ্ধ হেসে বললেন, ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র আমাকে খুব স্নেহ করেন। তিনি নিজে কবি এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর দখল যে কোনো কবির ঈর্ষার কারণ।

নবীন সেন আচমকা রবিবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বীরচন্দ্রের ছোঁয়া জল আপনাকে খেতে হয়েছে ?

রবীন্দ্রনাথ আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, সেটা আবার কি ?

নবীন সেন হেসে বললেন, আপনারা মানে ঠাকুর পরিবার কি ধরনের ব্রাহ্মণ ?

রবীন্দ্রনাথও হাসলেন, যেন মজা পেয়েছেন । বললেন, আমরা হলাম পিরালী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশ নীচের দিকে। আমাদের পরিবারে উঁচু ব্রাহ্মণেরা বিয়ের সম্বন্ধ করতে চায় না। তাই দেখবেন আমাদের বাড়ীতে কনেরা কেউই কলকাতার বনেদী ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে আসেননি। এঁরা এসেছেন পূর্ববঙ্গের যশোর বা তার কাছাকাছি গ্রামগঞ্জ থেকে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? রাজার ছুঁয়ে দেয়া জল খাওয়া, ঠাকুর পরিবারেরা কেমন ব্রাহ্মণ এসব কথা কেন জানতে চাইছেন নবীন সেন— কিছুই বুঝতে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ। সব তাঁর কাছে হেঁয়ালি মনে হচ্ছে।

নবীন সেন অবশ্য ধীরে ধীরে সব খোলসা করে বললেন। মহারাজা বীরচন্দ্রের জমিদারী চাকলা রোশনাবাদেরই একটি অংশ হল ছাগলনাইয়া থানা এবং পরশুরাম আউটপোষ্ট। কবি নবীন সেন সেখানকার সাব ডিভিশনাল অফিসার সংক্ষেপে এস ডি ও। পদটিতে যোগদান করার দিন সাতেকের মধ্যে ঐ এলাকার পাঠানগড়ে এক রায়ট শুরু হয়ে যায়। দাঙ্গা বেধেছিল জাতি উপজাতিদের মধ্যে। মহারাজা বীরচন্দ্রের জলাচরণের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় জাতিতে উন্নীত হবার পরেই ত্রিপুরা রাজ্য এবং চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর অধিবাসীরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল পেটোয়া, যারা অর্থের লোভে রাজার পক্ষে, অন্যদল জল খাইয়ে জাত খোয়ানোর জন্য রাজার বিপক্ষে এককাট্টা হয়েছে। যারা জলাচরণকে মেনে নেয়নি তাদের অসম্মানিত এবং অপমানিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য করা হয়েছে রাজদরবার থেকে। সহকারী রাজমন্ত্রী আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ডাঃ শম্ভুনাথ মুখার্জী জলাচরণ কান্ডকারখানার প্রথম বলি। তাছাড়া অনেকে আগে থেকেই মানসম্মান বজায় রেখে ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে দু'জন এস ডি ও এবং কয়েকজন মান্যবর উকিল কাজে ইস্তফা দিয়েছেন। উকিলদের অপরাধ, জলাচরণ নিয়ে কোর্টে যে মামলা দায়ের হয়েছে তাতে তাঁরা রাজার পক্ষে সওয়াল করতে

অসম্মতি জানিয়েছেন।

ঢাকা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার বনেদী এবং ধনবান ব্রাহ্মণেরা ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাদের জাত মারার পাল্টা নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাজার পারিষদেরা যারা রাজার সাথে সাথে ব্রাহ্মণদের জল খাইয়ে নব্য ক্ষত্রিয় হয়েছে তাদের তেজ আরও বেশী। তারা লেঠেল পাইকদের নামিয়ে দিয়েছে মাঠে। যারা রাজ্যে জলাচরণকে বিরোধিতা করছে সেইসব প্রজাদের ঠেঙ্গিয়ে বেশী বেশী করে কর আদায় করতে ওরা কোমর বেঁধে নেমেছে।

জাতি-উপজাতি দাঙ্গায় ধিকিধিকি করে জ্বলছে সারা রাজ্য। দাঙ্গার কারণটা বড় অদ্ভুত— রাজার ছুঁয়ে দেয়া জল বামুনদের জোর করে খাইয়ে দেয়াটা ঠিক কি ঠিক না। এমনিতে ত্রিপুরা রাজ্য ঋণের ভারে ডুবে যাচ্ছে। খরা বন্যায় ফসল হচ্ছে বিনষ্ট। লোকে দু'বেলা ভাল করে পেট পুরে খেতে পায় না। জীবনসংগ্রামে সমতলের লোকেরা যেমন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তেমনি পাহাড়ী লোকেদেরও দুর্দশার অন্ত নেই। এর মধ্যে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত রাজার চেলা-চামুন্ডারা বাড়িয়ে চলেছে তালুক এবং মহাল থেকে আদায়ীকৃত করের পরিমাণ। রাজ্যের লোক যেখানে ভাল করে খেতে পরতে পারছে না সেখানে তাদের রাজা ক্ষত্রিয় কি ক্ষত্রিয় না তাতে কি যায় আসে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। অন্তরালবর্তী কুশীলবেরা সুতো ধরে নাচিয়ে চলেছে ভোলেভালা ছাপোষা মানুষদের।

রবীন্দ্রনাথ কবি নবীন সেনের কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপারস্যাপার শুনে চক্ষু গোল গোল করে বললেন, বাপ রে! এত কান্ড, আমি তো কিছুই জানি না।

নবীন সেন বললেন, এই শেষ নয়। আরও আছে, শুনুন না সবটা।

কবি নবীন সেন গল্পের মত করে বলতে শুরু করলেন। তাঁর ভাষায়ঃ পাহাড়ী-বাঙালীদের দাঙ্গা একদিন হঠাৎ বেঁধে গেল পাঠানগড়ের খোদ কোর্ট চত্বরে। আমার অবশ্য কড়া হুকুম ছিল— শক্ত হাতে দাঙ্গা রুখতে হবে। পুলিশ দাঙ্গাবাজ কয়েকজনকে ধরে এনে হাজির করেছিল আমার সামনে। এদের মধ্যে একটি লোককে জেরা করে আমি জানতে পেরেছিলাম লোকটা উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী হলে কি হবে, আসলে সে ব্রাহ্মণই নয়। ঢাকার ব্রাহ্মণ বাঁচাও কমিটি থেকে সে টাকা খেয়ে এখানে জিগির তুলতে এসেছিল। একটা পাহাড়ী লোককেও পুলিশ পাকড়াও করেছিল। ব্যাটা নব্য ক্ষত্রিয় হয়েছে বামুনের জাত মেরে। নতুন যারা ক্ষত্রিয় হয়েছে, তাদের বেশ কিছু আচারআচরণ মানতে হত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের মত। যেমন, গলায় পৈতে রাখতে হবে, মদ মাংস খাওয়া চলবে না, নব্য ক্ষত্রিয়দের স্ত্রীরা রাস্তাঘাটে বের হতে পারবে না। পাহাড়ী ব্যাটা, তার শূয়ারের মাংস আর ভাত পচা চুয়াক মদ না খেলে কি আর চলে! পাহাড়ী বৌ-ঝিরা পরিশ্রমী। তারা বন থেকে কাঠ কুড়োয়, সমতলের বাজারে এসে বাঁশের কড়ুল বেচে। এখন ক্ষত্রিয় হওয়ার দৌলতে পাহাড়ীরা সব হারাতে বসেছে। মদ মাংস না খেয়ে খেয়ে জীবন বিস্বাদে ভরে গিয়েছে। তদুপরি মেয়েরা কাজকর্মে না বের হলে অলস

পুরুষেরা খাবে কি? রাজার তালে পড়ে ক্ষত্রিয় হয়ে হয়েছে ফ্যাচাং।

নবীন সেন আপন মনে হেসে নিয়ে বললেন, আমি পাহাড়ী লোকটাকে বললাম, ব্যাটা তোর পৈতে কোথায়? তুই কিসের ক্ষত্রিয়? লোকটা জবাব বলে পৈতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। উবু হয়ে মুততে বসলে পৈতে ভিজে যায়। বারে বারে পৈতে কানে গুঁজে রেখে উবু হয়ে বসতে মনে থাকে না। কি কান্ড, বলুন।

কবি নবীন সেন উদাত্ত হাসি হাসতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও হাসির দমক সামলানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ নিয়ে বললেন, তারপর কি হল?

কি আর হবে? নবীন সেন হাসতে হাসতে বললেন, আমি দু'জনকে ডেকে বললাম, হারামজাদারা,তোরা দু'জনে কান ধরে উঠবোস কর, এই তোদের শাস্তি। কিন্তু ব্যাটারা কিরকম বজ্জাত জানেন তো, নিজের কানে নিজে ধরবে না, তাতে তাদের মান সম্মানে নাকি লাগে। তখন আমি বললাম, তো ঠিক আছে। পাহাড়ীটাকে বললাম, তুই বাঙালীটার কান মুলে দে। আর বাঙালীটাকে বললাম, তুই কান মুলে দে পাহাড়ীটার। দাঙ্গা বাধানোর জন্য এই তোদের শাস্তি। আমার সামনে দু'জনেই কান মুলতে শুরু করল। নিজের কান নিজে না মুললে অন্যে মুলে দেবে— তাতে জাত্যভিমান ক্ষুণ্ণ হয় না বোধহয়।

কবি নবীন সেন এবং রবীন্দ্রনাথ উচ্চস্বরে হো হো করে হাসতে লাগলেন। পাশের লোকজন অবাক হয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই। এই হাসির দমকা হাওয়ার মধ্যে সভাপতি মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস ব্যানার্জী সভাগৃহে প্রবেশ করে মঞ্চে উঠে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

যদিও রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরোধিতার ফলে (জলাচরণ) আন্দোলনটি তার শক্তি চার পাঁচ বছরের মধ্যেই হারিয়ে ফেলেছিল, তবে আরও কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো আন্দোলনটি তার স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অবশেষে লুপ্ত হয়ে যায়।

জলাচরণ আন্দোলনের পর একশ বছরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এটি ২০০১ সাল। আশ্চর্য, অদ্ভুত এক মিল। এক্ষুণি সারা ত্রিপুরায় চলছে জাতি-উপজাতির মধ্যে অবিশ্বাসজনিত এক আত্মঘাতী সংঘর্ষ। এতে কার যে লাভ, কার সর্বনাশ এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সবটাই অস্পষ্ট ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন। সমগ্র ত্রিপুরা জুড়ে জাত্যভিমান নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাঙালীরা, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে উপজাতিরা। অন্তরাল থেকে কুশীলবেরা সুতো নাড়ছে, আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে জনপদ। মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যত্রতত্র। মৃতের আবার কি পরিচয় ? মৃত কি কখনও আলাদা করে বাঙালী বা উপজাতি হতে পারে ? ত্রিপুরার পত্রপত্রিকাগুলো তাদের অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদনে অবশ্য মৃত্যুতেও বৈষম্য খুঁজে পায়। আগরতলা থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সদর কার্যালয় খুমলুঙের কাছে গুলীবিদ্ধ যে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়, সে উপজাতি যুবক। ইনার লাইন পারমিট বা রাজ্যের ভেতর রাজ্য কাকে বলে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। আবার বিশ্রামগঞ্জের কাছে ক্ষেতের আলে যে বয়স্ক লোকটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল তার কোমরে ছিল পৈতে। লোকটা সম্ভবতঃ বামুন, অবশ্য আসল না নকল সঠিক বলা মুশকিল। মৃত্তিকা থেকে জীবনের রসদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে লোকটা উপুড় হয়ে শুয়েছিল। দুনিয়ার বাঙালী এক হও শ্লোগানে লোকটির অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল।

ত্রিপুরা এই বসুন্ধরার এমনই একটি ভূখন্ড যেখানে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যবর্তী দেওয়াল মাঝেমাঝেই আত্মঘাতী ভ্রাতৃ সংঘর্ষের ফলে আবছা এবং অদৃশ্য হয়ে ওঠে। এবং ইতিহাস সাক্ষী, ক্ষুদ্র এই ত্রিপুরা রাজ্যটি যথাযথ মূল্য চুকিয়ে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে সক্ষমও হয় একদিন।



তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর

এক

শুভ্র পট্টবাস সারা রাত্রির শেষে এখন মলিনপ্রায়। কাঁধে শ্বেত উত্তরীয়, নগ্ন গা মহারাজা বীরচন্দ্র ভোরবেলায় অসময়ে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে পায়চারি করছেন। অন্তঃপুরে রাজমহিষী এবং পরিচারিকারা ঘুমোচ্ছে। কাল সারারাত ঝুলনোৎসব ছিল। সবাই ঘুমোলেও বীরচন্দ্র জেগে আছেন। এমনিতেই তিনি দেরী করে ঘুম থেকে ওঠেন আর ঝুলনের পরদিন তো দুপুরের আগে তাঁর শয্যাত্যাগ করার কথা না তাই চারদিকে কাউকে সজাগ বা ত্রস্ত দেখা যাচ্ছে না। মহারাজা জেগে আছেন অথচ অন্যেরা জেগে নেই—এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা।

রাজবাড়ীতে ঝুলনোৎসবটি খানিকটা অন্য ধরনের। উৎসবে একমাত্র পুরুষ হলেন মহারাজা বীরচন্দ্র আর অন্যান্য সবাই হল অন্তঃপুরচারিনী নারীরা। উৎসবের আঙ্গিনায় অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। পুরো বিকেল জুড়ে বীরচন্দ্রকে পুষ্পচন্দনে সাজিয়েছে মেয়েরা। এখনও ললাটে চিবুকে চন্দনের চিহ্ন স্পষ্ট । অবশ্য চন্দনের মাঝেমাঝে স্বেদবিন্দু বীরচন্দ্রের মুখচ্ছবিকে বড়ই বেমানান করে তুলেছে । ধারেকাছে কেউ নেই, ডাকলেও কাউকে তিনি পাবেন না, তবু বীরচন্দ্র রাগান্বিত হন । বীরচন্দ্র অসহায় রিক্ত নিঃস্বের মত তখন থেকে পায়চারি করে যাচ্ছেন । তিনি যে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা, তাঁর ভয়ে সবাই কম্পমান — সেসব তিনি যেন বিস্মৃত হয়েছেন।

ঝুলন নিয়ে রাজবাড়ীর উৎসবটি কেউ স্বচক্ষে দেখেনি কোনদিন কিন্তু শুনেছে সবাই। আর একমাস ধরে রিহার্সালের ব্যাপার-স্যাপার দেখে অনেকে আন্দাজ করে নেয় বাকীটা । নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ করেন রাণীরা । রাণীদের সহচরীরা। হয়ত হারমোনিয়ামে কোন ঈশ্বরী, তো পাখোয়াজ বাজাবেন মধ্যম রাণী আর করতাল হাতে অন্য এক রাণীর অনূঢ়া বোন । গান গাইছে রাজকন্যা একজন, তার সংগে নৃত্য পরিবেশন করছে রাজদুহিতার পিসিমণি । অবশ্য এই ঝুলনের জন্য গান লিখেছেন এবং তাতে সুর দিয়েছেন মহারাজা বীরচন্দ্র স্বয়ং। রাজ অন্তঃপুরের কদম্বগাছের চতুষ্পার্শ্বে রয়েছে কেয়ারি করা বাগিচা। বীরচন্দ্রের একাধিক স্ত্রী । তাঁরা অসমবয়সী। বড় ঈশ্বরী ভানুমতী গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর হল। অন্যান্য ঈশ্বরী এবং বিবাহিতা স্ত্রীর সংখ্যা আঙ্গুলে গুণে শেষ করা যায় না। মাত্র কিছুকাল আগে যাঁকে বিয়ে

করেছেন বীরচন্দ্র, তিনি তাঁর নাতনীর বয়সী। ঝুলনের সময় প্রৌঢ়া, যুবতী এবং কিশোরী ভার্যা সবাই কিছু না কিছু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেনই। বীরচন্দ্র হলেন মধ্যমণি, তিনি হলেন কেষ্টঠাকুর।

বীরচন্দ্র একটা ফুলডোর দিয়ে বাঁধা দোলনায় বসে দোল খাচ্ছেন, তার পাশের জায়গাটি খালি। ঐ জায়গাটিতে কে বসবেন, এ নিয়ে রেষারেষি। আড়ালে চুলোচুলিও বাদ যায় না। অবশ্য নিজে থেকে কেউই এসে এখানে বসতে সাহস পাবেন না — মহারাজা না ডাকলে। মেজ ঈশ্বরী রাজরাজেশ্বরী পদমর্যাদা অনুসারে অনুষ্ঠানের শুরুতে কিছুক্ষণের জন্য বীরচন্দ্রের পাশে এসে বসেছিলেন। কিন্তু দোলনাটি খানিকটা দুলতেই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন প্রায়। তাঁর এরকম হওয়াটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত ছিল না। রকমারি ব্যামোতে ভুগে ভুগে তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। তাঁকে ধরে ধরে এনে এখানে বসানো হয়েছিল। মূর্ছা যাবার আগেই তাঁকে ধরে ফেলা হয়। এখন তাঁকে নিজ অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রাজচিকিৎসককে খবর দেয়া হয়েছে। তাঁর ভালো মন্দ যা হয় তা চিকিৎসকই দেখবেন। মহারাজা বীরচন্দ্রের কিছু করার নেই। তিনি ঝুলনের সুধাস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন।

রাজরাজেশ্বরী রাণীমার এখন তখন অবস্থা। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। ঝুলন অনুষ্ঠান জমে উঠতে লাগল। সহচরী কে যেন গোলাপজল ছিটিয়ে দিল মহারাজার গায়ে। বিলোল কটাক্ষ হেনে তরুণী এক রাণী বীরচন্দ্রকে ফুল ছুঁড়ে মারলেন। বীরচন্দ্র নিজেও কিছু ফুল তুলে নিয়ে এলোমেলো অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুঁড়ে মারলেন। কোলাহল করতে করতে ফুলগুলো কুড়িয়ে নিলো কেউ কেউ। মৃদঙ্গের তালে নৃত্যগীত, পুষ্পবৃষ্টি, চারপাশের গোলাপজলের সুরভিতে বীরচন্দ্র জোৎস্না রাতে যখন নৈসর্গিক আনন্দধারায় স্নাত — তখন অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদের ভীড় ঠেলে সবার অজ্ঞাতে এক অন্য রমণী এসে বীরচন্দ্রের কানে কানে কি যেন বলল। বীরচন্দ্র সম্বিতে ফিরে এলেন। কাউকে কিছু বুঝতে দিলেন না। আনন্দানুষ্ঠান চলতে থাকল, শুধু বীরচন্দ্র মাঝেমাঝে আনমনা হয়ে যেতে লাগলেন।

আরও রাত বাড়লে বীরচন্দ্র হঠাৎ দোলনা থেকে নেমে নাচগানের মাঝখানে আঙ্গিনায় এসে বললেন, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আমি বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি। তোরা চালিয়ে যা।

সমস্ত কলরোল কোলাহল আচমকা থেমে গেল। সবাই সবার দিকে তাকাতে লাগল। ঝুলনের ইতিহাসে এরকম কাণ্ড কখনই ঘটেনি। রাজরাজেশ্বরীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার একটা কারণ ঘটেছিল ঠিকই। কিন্তু ইতিমধ্যে খবর এসেছে, তিনি এখন ভালো আছেন। কোন আশু বিপদ বা আশংকার কারণ নেই। তাহলে এমন কি হল যে; মহারাজা ঝুলন অসমাপ্ত রেখে চলে যেতে চান। যতই সেজেগুজে রূপের পসরা সাজিয়ে রাণী বা তাঁদের সহচরীরা থাকুন না কেন — তাঁদের কারোরই মহারাজাকে প্রশ্ন করার সাহস বা এক্তিয়ার নেই।

মহারাজা বীরচন্দ্র আস্তে আস্তে হেঁটে নিজের মহলের দিকে রওনা হলেন। কাঁধের উত্তরীয়

লুটিয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ বাদে এমনিতেই অবশ্য ঝুলনের নাচগান শেষ হত। বীরচন্দ্রের আচমকা ঘোষণায় দারুণ রসভঙ্গের কারণ ঘটল। ঘরে এসে বীরচন্দ্র বিছানায় শুতে গেলেন না। বরং বারান্দায় খালি পায়ে অবিরাম পায়চারি করতে লাগলেন। রাজসিংহাসনে বসার পর থেকে বীরচন্দ্রের অনেক বিনিদ্র রজনী কেটেছে। তবে আগের অন্যান্যবারের সংগে এবারের উৎকণ্ঠার কোন তুলনা হয় না। যতবারই দুর্যোগ এসেছে, তিনি সেগুলোকে সামলেছেন। তখন তাঁর বয়স কম ছিল, শরীর মন ছিল সতর্ক এবং টানটান। এখন অনেক নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন তিনি, রক্তের উষ্ণতাও কমে এসেছে। আঘাত আসার আগেই পাল্টা আঘাত হানার জন্য যে মনের এবং শরীরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া, তা অনেক ভোঁতা হয়ে গিয়েছে তাঁর। বীরচন্দ্র বুঝতে পারেন আগের সেই দিনগুলো আর নেই। সময়ের প্রবাহে পৌরুষও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়।

চারপাশে রোদ কড়া হয়ে উঠেছে। অনেক বেলা হল তবু রাজবাড়ীতে কলরব নেই। বীরচন্দ্রকে এই নীরবতা আরও বিমর্ষ করে তোলে। বারান্দা থেকেই দেখা গেল, দূরে দীঘির পাড় বেয়ে মহিম আসছেন। মহিমকে দেখে তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। এই প্রথম হাঁটাহাঁটি বন্ধ রেখে আরামকেদারায় কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। মহিম অন্যমনস্ক হয়ে বারান্দা পেরিয়ে যেতে যেতে আরামকেদারায় মহারাজাকে দেখতে পেয়েও তাঁর বিশ্বাস হল না যে মহারাজাই এখানে শুয়ে আছেন। চোখ দু'টো ভালো করে কচলে মহিম যখন দেখলেন দৃষ্টি মিথ্যে বলছে না, তক্ষুণি সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করার জন্য মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন।

বীরচন্দ্র আস্তে আস্তে মৃদু গলায় বললেন, কি রে মহিম ? এই সাত-সকালে কেন এসেছিস? মহারাজা যে সজাগ, তিনি যে মহিমকে দেখেছেন তা জেনে মহিম আরও ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে কোন বাক্য সরল না। বোবা হয়ে তাকিয়ে রইলেন মহিম।

বীরচন্দ্র নিরাসক্ত ভাবে বললেন, চিঠিটা এনেছিস ? কাল রাতে গ্রীয়ার সাহেব যেটা দিয়েছিল আমাকে দেয়ার জন্য ? তুই নাকি নিজেই একটা উত্তরও দিয়েছিস গ্রীয়ারের চিঠির ?

মহিমের সারা শরীর কাঁটা কাঁটা দিয়ে উঠল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, আমাকে ক্ষমা করুন, মহারাজ। আমি যদি অন্যায় করে থাকি, তবে না জেনে করেছি। জ্ঞানত কোন দোষ করিনি।

বীরচন্দ্র নিজেই হাসলেন। তারপর রসিকতার ছলে বললেন, তুই এত দূরে থাকিস না। আমার কাছে আয়। তারপর হাঁ কর, হাঁ।

মহিম জিভ কামড়ে দুহাতে নিজের দু'কান মুচড়ে ধরে কাছে আসার বদলে বরং আরও দূরে গিয়ে দেয়ালের সাথে ভয়ে সিঁটিয়ে রইলেন।

বীরচন্দ্র মুচকি হেসে বললেন, কাল রাত্তিরে নাকি খুব মাল টেনেছিস ? সহ্য না করতে পারলে ওই ছাইপাঁশ খাস কেন? থাক সে কথা। এখন বল, পলিটিকেল এজেন্ট গ্রীয়ার

সাহেব মুখে কিছু বলেছে কি না ?

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এসে মহিম গ্রীয়ারের দেয়া বন্ধ লেফাফাটি মহারাজার হাতে তুলে দিলেন । মুখে কোন শব্দ করলেন না । কেননা, মুখ খুললে আরও বিপদ বাড়তে পারে ।

মহিমের অবস্থা যেন এখন স্নানটান করিয়ে আনা বলির জন্য তৈরী পাঁঠার মত । সারা শরীরের রোমগুলো খাড়া খাড়া। মহিম কাল নিজের বাড়ীতে বসে ঝুলন রাতে জোৎস্নায় মদ্যপান করেছিলেন — সোডা সহকারে 'পিক্ মি আপ'। মহারাজা নিজে ঝুলনোৎসবে মেতে আছেন, মহিমের ডাক পড়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। নিশ্চিন্তে মহিম সুধাপান সহ বীরচন্দ্রেরই লেখা ঝুলনগীতি পাঠ করছিলেন। তক্ষুণি দরজায় একটি ঘোড়ার গাড়ী এসে থেমেছিল। গাড়ী থেকে নেমে পত্রবাহক একজন মহিমকে গভর্ণমেন্টের সিলমোহর দেয়া চিঠি দিয়ে যায়। নেশায় আচ্ছন্ন হলেও মহিমের জ্ঞান ছিল টনটনে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হার ম্যাজেষ্টিজ সার্ভিস লেখাটি দেখেই চমকে ওঠেন মহিম। তড়িঘড়ি চেয়ার থেকে উঠতেই মদ এবং সোডার বোতল গড়িয়ে পড়ে যায়। মহিম এক দৌড়ে দরজায় এসে দেখেন, ঘোড়ার গাড়ীতে বসে আছেন ত্রিপুরার ব্রিটিশ প্রতিনিধি পলিটিকেল এজেন্ট গ্রীয়ার সাহেব। তিনি সম্ভবত কুমিল্লা থেকে এসেছেন। আগরতলায় পৌঁছুতে তাই রাত হয়ে গিয়েছে। সংগে আছেন স্থানীয় অ্যাসিট্যান্ট পলিটিকেল এজেন্ট উমাকান্ত দাস।

গ্রীয়ার বড় অসময়ে এলেও মহিম এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামতে বলেন। মহিমের সংগে গ্রীয়ার সাহেবের আগেই জানাশোনা ছিল। মহিম কুমিল্লাতে একাধিকবার গ্রীয়ারের অতিথি হয়ে তার সরকারী আবাসে রাত কাটিয়েছেন। অনেক বলার পরেও গ্রীয়ার নেমে আসতে রাজী নন দেখে মহিম বেশ অবাক হলেন। ঝুলন রাত্রিতে এক পেগ হলে কেমন হয়, এই আমন্ত্রণও গ্রীয়ার যখন বিনয়ের সংগে প্রত্যাহার করলেন, তখন মহিমের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। সবকিছুই কেমন যেন বেসুরো লাগছে, কিছুই হিসেবের সংগে মিলছে না। মহিম খুবই ক্ষুব্ধ হলেন।

শীতল কণ্ঠে মহিম বললেন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি, গ্রীয়ার সাহেব ?

গ্রীয়ার সৌজন্য সহকারে বললেন, মহিম, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না । আমি এবার অফিসিয়েল ডিউটিতে এসেছি । আমি দুঃখিত এক্ষুণি আপনার সংগে মদ্যপানের আসরে যোগ দিতে পারি না। মহারাজার সংগে অফিসিয়েল কাজ শেষ হয়ে গেলে তারপর আমি আপনার সংগে ডিনার এবং ড্রিংক করতে পারব।

ভীষণ অবাক হলেন মহিম, কি এমন অফিসিয়েল কাজ যে গ্রীয়ার গাড়ী থেকে নামবেন না পর্যন্ত, পানাহার তো দূরের কথা ।

গ্রীয়ার খুব বিনীতভাবে বললেন, মাই ফ্রেণ্ড মহিম। আপনি আমাকে একটা ফেভার

করুন। এখনও খুব একটা রাত হয়নি। আপনি দয়া করে মহারাজার সংগে আমার জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিন।

আপনি কি পাগল হয়েছেন, গ্রীয়ার সাহেব। অল্প-স্বল্প নেশা হলেও গ্রীয়ারের আব্দার শুনে চিত্ত জ্বলে গেল মহিমের। এখন ঝুলনে মেতে আছেন মহারাজা। কোন পুরুষ এখন সেখানে যেতে পারবে না। পলিটিকেল এজেন্ট গ্রীয়ার যত বড় পদস্থ কর্মচারীই হোন না কেন, তাঁর যত জরুরী কাজই থাকুক, এ সময়ে কারোরই ঝুলনোৎসবে মহারাজার কাছে যাবার অধিকার নেই। মহারাজার মোট ন'জন পুত্র এবং ষোলজন কন্যা। রাজপুত্রদের মধ্যে ইতিমধ্যে একজন বা দু'জন ভূমিষ্ট হয়েছেন, তাদের হয়ত এক বছর বয়সও পূর্তি হয়নি। তারা এখনও মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপান করে। ঝুলনোৎসবে এদেরও প্রবেশাধিকার নেই। সেক্ষেত্রে জলজ্যান্ত পুরুষের মূর্তিমান প্রতীক গ্রীয়ার সাহেব মহারাজার সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করতে চান শুনে মহিম হতভম্ব হয়ে গেলেন। তবে গ্রীয়ারকে সব খুলে না বললে বুঝতে পারবে না। তাই মহিম কায়দা করে বললেন, মহারাজা এক্ষণে অন্তঃপুরে ধর্মীয় তপস্যায় গভীরভাবে নিমগ্ন আছেন। এখন তাঁকে ডিস্টার্ব করা যাবে না। দর্শনের জন্য কাল সকাল পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

গ্রীয়ার তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, ঠিক আছে। আপনি প্লীজ আমাকে লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্টের টাইমটা জানিয়ে দিন। আমি কাল সে সময়েই দেখা করব।

মহিম বুঝলেন, বিষয়টি লঘু নয় খুবই গুরুতর। মনে মনে একটা হিসেব কষলেন মহিম। মহারাজা ঝুলনে সারারাত মেতে থাকলে সকালে ঘুমোবেন। ঘুম থেকে উঠতে দেরী হবে। মহিম দুপুর বারোটায় সাক্ষাতের সময় লিখে একটা খামে কাগজটা পুরে গ্রীয়ারের হাতে তুলে দিলেন।

গ্রীয়ার চিঠিটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে পড়ে বললেন, সময়টা কি কিছুটা এগিয়ে নিয়ে আসা যায় না? আরও আগে হলে ভাল হত। আমি মহারাজার সংগে কথাবার্তা বলে কালকেই কুমিল্লায় ফিরে যেতে চেয়েছিলাম।

গ্রীয়ারের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিকেল এজেন্ট উমাকান্ত দাস। মহিম গ্রীয়ারের কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, উমাকান্তবাবু, কি ব্যাপার বলুন তো? এমন কি সাংঘাতিক ব্যাপার যে সকাল বিকেলের জন্য মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

উমাকান্ত দাস নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন, আপনি গ্রীয়ার সাহেব যা জানতে চেয়েছেন তার জবাব দিন। বারোটার বদলে সকাল আটটায় সাক্ষাতের সময়টা করলে কেমন হয়। তাহলে কাজ শেষে বেলা থাকতে থাকতেই আগরতলা থেকে মোগরা হয়ে পলিটিকেল এজেন্ট সাহেব কুমিল্লা ফিরে যেতে পারেন। গ্রীয়ার সাহেবের সময়ের দাম আছে, এখানে তিনি সময় নষ্ট করতে আসেননি।

সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী। মহিম ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, সময়টা আমি নিজে দিয়েছি।

মহারাজার এজন্য অনুমতি নিইনি । কাল একবার মহারাজার সংগে কথা বলে দেখব। তবে আপনারা জেনে যান, সাক্ষাতের সময় পিছুতে পারে এগোবার সম্ভাবনা নেই।

গ্রীয়ার এবং উমাকান্ত দাস ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলে মহিম এসে আবার মদ্যপানে বসলেন । ইতিমধ্যে মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়েছে । নেশা এমন জিনিষ, একবার টুটে গেলে আর সহজে ফিরে আসতে চায় না ।

কাল রাত থেকে এই সকাল— মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। কিন্তু এর মধ্যে মহারাজা বীরচন্দ্রের গোচরে সমস্ত বিষয়টি এল কি করে ভেবে কূল পেলেন না মহিম। কুমিল্লা থেকে গ্রীয়ারের আগরতলায় আসা, রাত্রিবেলাটুকু গেষ্ট হাউসে থাকা ও চিঠির আদান-প্রদান শুধু মহিম ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। তাছাড়া পুরো সময়টা মহারাজা ছিলেন ঝুলনোৎসবে, সেখানে কারো প্রবেশাধিকারই নেই। মহারাজা চর এবং পাল্টা চর পোষেন ঠিকই— কিন্তু তারা যে মহিমের ওপরও নজরদারি রাখে সেটা জেনে মহিম ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। মহিমের মেরুদণ্ড বেয়ে হিমশীতল এক স্রোত নেমে এল।

বীরচন্দ্র ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু অম্লান রেখে বললেন, ভয় পাস্ নে। যা করেছিস, ঠিকই করেছিস্। সাহেবগুলো সব পাজির পা ঝাড়া । তাদের খুব একটা পাত্তা দিস না। তুই গ্রীয়ারকে বারোটায় আসতে বলেছিস? বরং তুই আর একটা খবর পাঠিয়ে দে, বারোটায় নয় যেন বিকেল চারটেয় আসে। আমি দুপুরবেলাটা ঘুমোব। কাল রাতে ঘুমোইনি। এখন যা ।

মহিম তবু দাঁড়িয়ে রইলেন, যাব কি যাব না ভাবছেন। আরাম-কেদারা থেকে উঠে কাছে এসে বীরচন্দ্র বললেন, তুই কি ভাবছিস, আমি জানি। তুই ভাবছিস, কি করে আমি সব জানলাম। কি করে আমি সব জানি তোর তা জেনে কোনো কাজে আসবে না। শুধু শুধু চিন্তা করে লাভ নেই। আর শোন, গ্রীয়ারের সংগে রয়েছে উমাকান্ত। এটাও একটা চীজ। যখন গ্রীয়ার সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, উমাকান্তটাকে আটকাবি। আমার কাছে আসতে দিবি না । ঠিক আছে ? এবার যা।

যাবার জন্য রওয়ানা হয়ে পা বাড়াতেই পেছন থেকে মহিমকে ডেকে বীরচন্দ্র বললেন, না, থাক। উমাকান্তকে আসতে দিস। দেখি তার দৌড় কতটা।

দুপুর থেকে পাত্র-মিত্র-সভাসদ সবাই ধরা-চূড়া পরে এসে বসে আছে রাজদরবারে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি গ্রীয়ার ছোট লাট সাহেব টমসনের এক জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছেন, খবরটা দাবানলের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কি সে বার্তা, তার ফল যে কি হবে কেউই তা আঁচ করতে পারছে না। মহারাজা বীরচন্দ্র এক দুর্জ্ঞেয় চরিত্র । তাঁর মনে যে কি আছে, তা অন্যে কেন তিনি নিজেও জানেন কি না সন্দেহ । সবাইকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও ঝুলনের পরদিন রাজদরবার ছুটি-হেতু বসবার কথা ছিল না, কিন্তু বিশেষ কারণে আহূত অধিবেশনে সবাইকে হাজির থাকতে হবে। সভাসদ সবার নিজ নিজ বাড়ীতে কাল রাতে খানাপিনা ফূর্তি হয়েছে । আজ ছিল মৌজ করে ঘুমোবার, অবসর নেবার দিন। কিন্তু, সেসব ফেলে রেখে সবাইকে ছুটে আসতে হয়েছে। আর এসে এখন ঠায় বসে থাকতে

হচ্ছে। সবাইকে ডেকে এনে মহারাজা বীরচন্দ্র নিজে ঘুমোচ্ছেন। গ্রীয়ারের সংগে যে সাক্ষাতের সময় দেয়া হয়েছে তাও পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ । মহারাজা এখনও আসছেন না। গ্রীয়ার এবং উমাকান্ত ক্ষুব্ধ । তাঁরা বারেবারে উষ্মা প্রকাশ করছেন। সময় দিয়ে সময় না রাখতে পারলে সময় দেয়ার কোন মানে হয় না। এটা অনেকটা অপমানের সামিল। পারিষদেরা বিব্রত বোধ করছে। মহারাজা নিজের লোকজনদের সংগে যা-ই ব্যবহার করুন আর না করুন, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের লোকের সংগে এ রকম ব্যবহার না করলেই ভালো করতেন। অবশ্য কারোরই এমন বুকের পাটা নেই যে ভেতরে গিয়ে মহারাজাকে ঘুম ভাঙিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দরবারে নিয়ে আসে। তবে আদৌ তিনি ঘুমোচ্ছেন কিনা, তাও কারোর জানা নেই।

এতক্ষণ ধরে দরবারে সবাই নীচুকণ্ঠে বাক্যালাপ করছিল নিজেদের মধ্যে । তাই গুঞ্জনের একটা গমগমে আওয়াজ দেয়াল থেকে দেয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। হঠাৎ নিথর নিস্তব্ধতা নেমে এল রাজদরবারে। দেখা গেল, অন্তঃপুরের অলিন্দ বেয়ে মহারাজা দরবারের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় ঠিকরে উঠছে মহারাজার মস্তকের উষ্ণীষ থেকে হীরের দ্যুতি। পরিপাটি পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছদ পরেছেন মহারাজা । এমন কি কটিবন্ধে ঝুলছে দীর্ঘ কোষবদ্ধ তলোয়ার। এরকম আনুষ্ঠানিক রাজবেশে ভূষিত মহারাজাকে স্মরণকালে দেখা যায় নি। মহারাজা সোপান বেয়ে সিংহাসনে আরোহন করলেন। উপস্থিত সভাসদেরা দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল মহারাজাকে। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে, মহারাজা দুপুরটা পুরো ঘুমিয়েছেন। তার মুখচোখ এখনও ঢুলুঢুলু, ঘুম খুব ভালো হয়েছে, কোন বিঘ্ন ঘটেনি।

দুই

হাত তুলে ইশারা করে ডাকতেই মহিম গ্রীয়ারকে নিয়ে মহারাজার কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন। গ্রীয়ার খানিকটা ঝুঁকে মহারাজার ডান হাতটা তুলে নিয়ে তাতে ছোট্ট একটি চুম্বন করে বললেন, ইয়োর হাইনেস, আমি কেন এসেছি আপনি হয়ত জানেন । ছোট লাটসাহেব টমসনের একটি সীলমোহর দেয়া চিঠি কাল মহিমকে আমি দিয়েছিলাম । আপনি নিশ্চয়ই চিঠিটা পড়েছেন ?

অসীম বিরক্তি প্রকাশ করে বীরচন্দ্র বললেন, টমসন সাহেবের চিঠি আমি পড়েছি। কিন্তু আমার তাতে কি করার আছে ?

নম্রকণ্ঠে গ্রীয়ার বললেন, এ ব্যাপারে আলোচনার জন্যই এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। আপনার মতামত জেনে আমার গভর্ণমেন্টকে তা জানাতে হবে ।

আমার আবার মতামত কি ? মহারাজা ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন, মতামত তো ছোটলাট সাহেব দিয়েই বসে আছেন। সাধারণত প্রথমে আলোচনা হয়, তারপরে একটা মতামতে পৌঁছায়। এখানে শুরুতেই মতামত দেয়া আছে, এখন আর আলোচনা করার সুযোগ কোথায় ?

কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ বীরচন্দ্র সিংহাসন থেকে ঋজু হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কেন

যেন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল । কোষবদ্ধ তরবারির হাতলে মুষ্টিবদ্ধ হাত রেখে চীৎকার করে তিনি বলে উঠলেন, গ্রীয়ার ! তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও। গিয়ে তোমার ছোটলাট সাহেবকে বলো, ত্রিপুরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অধীন নয়। আমি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সৌজন্যমূলক বার্ষিক নজরানা দিই বটে তবে আমার রাজ্য হল স্বাধীন ত্রিপুরা । তোমার মনিবকে প্রিভি কাউন্সিলের রায় পড়তে বলো। ত্রিপুরাতে ব্রিটিশ আইন চলে না। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে— শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। তবে মনে রেখো গ্রীয়ার, ব্রিটিশের খবরদারি আমি মোটেই বরদাস্ত করি না। তোমার টমসনকে গিয়ে বলো, মহারাজা বীরচন্দ্র বলেছেন, ফোঁপরদালালির একটা সীমা আছে ।

একটানা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে বীরচন্দ্র হাঁপাতে শুরু করলেন। তাঁর হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হল। তিনি অবসন্ন হয়ে আবার সিংহাসনে বসে পড়লেন। সিংহাসনের দুপাশে দু'জন চামর দোলাচ্ছিল, তারা জোরে বাতাস করতে শুরু করে দিল। মহিম এবং রাজবদ্যি দৌড়ে মহারাজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মহারাজা হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিলেন। সারা দরবার জুড়ে নেমে এল শংকাকুল স্তব্ধতা। বীরচন্দ্র চোখ বন্ধ করে শ্বাসকষ্ট সামলাতে চেষ্টা করছেন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সংগে সংগে তাঁর বুক ওঠানামা করছে । আস্তে আস্তে যখন শ্বাসকষ্টটুকু কমে এল তখন দেখা গেল, মহারাজা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর নাক সশব্দে ডাকতে শুরু করেছে।

গ্রীয়ার উমাকান্তর দিকে তাকালেন । সময় বয়ে যাচ্ছে। সভাসদেরাও মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। তবে কারোর মুখে কোন শব্দ নেই। শব্দ একটাই, তা হল মহারাজার নাক ডাকার শব্দ। যা সবাই শুনতে পাচ্ছে অথচ মহারাজা নিজে শুনতে পাচ্ছেন না।

নিজে থেকেই মহারাজার ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ । হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে চারপাশে সবাইকে দেখে ভীষণ লজ্জিতবোধ করলেন তিনি। নাক ডাকার বহর দেখে মনে হয়েছিল, ঘুমটা দীর্ঘায়িত হবে। অথচ এত অল্প সময়ে নিদ্রা ভেঙে যাওয়ায় সভাসদেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গ্রীয়ার খানিকটা এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে বললেন, ইয়োর হাইনেস্। আপনার শরীরটা ভালো নেই — আজ আলোচনা থাক ।

অল্প থেমে গ্রীয়ার আরও বললেন, তাছাড়া প্রকাশ্য রাজদরবারে এসব আলোচনা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে হয় না । পরে যখন আলোচনা হবে, অনুগ্রহ করে সেটা প্রাইভেট প্লেস-এ করবেন।

অধৈর্য হয়ে মহারাজা বললেন, আমার শরীর ভালো আছে। পরে আলোচনা করার দরকার নেই। তোমার যা বলার এখনই বলো ।

গ্রীয়ার দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আপনি যদি এখনই আলোচনা করতে চান তো ভাল কথা। আমাকেও কাজ সেরে তাড়াতাড়ি কুমিল্লা ফিরে যেতে হবে । তবে চলুন, আমরা বাইরে অন্য কোথাও গিয়ে বসি, যেখানে এত লোকজন থাকবে না ।

দরবারে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। গ্রীয়ার তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন । গ্রীয়ার রাজদরবারকে উপেক্ষা করে বস্তুত অপমান করছেন। বীরচন্দ্র হাত তুলতেই গুঞ্জন থেমে গেল।

ঠিক আছে। চলো, অন্দরমহলের পেছনের দিকটায় কেয়ারি করা ফুলের বাগিচায় গিয়ে বসা যাক। বীরচন্দ্র ক্লান্তি সত্ত্বেও উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলেন ।

এই সেই ফুলের কুঞ্জবন — কাল এখানেই ঝুলনোৎসব হয়েছিল। এখনও বাসি ফুল, ফুলের মালা এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে । মুখোমুখি বসলেন মহারাজা ও গ্রীয়ার। আর গ্রীয়ারের পাশে উমাকান্ত। মহারাজা ইংরেজী বোঝেন কিন্তু বলতে পারেন না । আবার গ্রীয়ার বাংলা বুঝতে পারেন তবে সড়গড় নন। উমাকান্ত বাংলা এবং ইংরেজী দুই-ই ভালো বুঝতে এবং বলতে পারেন। তাই উমাকান্তর কাজ হল দোভাষীর। অবশ্য উমাকান্ত রাজদরবারে মহারাজা এবং গ্রীয়ারের মধ্যে এ কাজটিই করছিলেন । উমাকান্ত নিভৃত আলোচনায় উপস্থিত থাকুন প্রথমে বীরচন্দ্র চাননি । কিন্তু পরে ভেবেচিন্তে মত বদলেছেন। আলোচনার শুরুতে গ্রীয়ার সহজভাবে হেসে বললেন, মহারাজ, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না— আমি শুধু আজ্ঞাবহ। আপনি ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে আপনার মতামত জানাবেন । আপনি আপনার রাজ্যের মঙ্গল চান, কল্যাণ চান । আপনি নিশ্চয়ই আবেগের বশীভূত হয়ে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতি হতে পারে ।

বীরচন্দ্র বিরক্ত হয়ে গ্রীয়ারকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে আর জ্ঞান দিয়ো না। বরং স্পষ্ট করে বলো, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কি চায় । ধানাইপানাই ছাড়ো।

স্পষ্ট করে বললে আমাকে বলতে হবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট চায়, দায়িত্বশীল কারোর হাতে ত্রিপুরার শাসনভার ন্যস্ত থাকুক। গ্রীয়ার অকপটে কথাটা বলে বীরচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মুহূর্তের জন্য বাকরহিত হয়ে গেলেন বীরচন্দ্র। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় আমি দায়িত্বশীল নই। আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন। একটা উদাহরণ তুমি আমাকে দাও, যখন আমি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছি ।

মহারাজ, একটা নয়। একের পর এক আমি অনেক ঘটনা উল্লেখ করতে পারব যেগুলো দ্বিধাহীনভাবে সাক্ষ্য দেবে যে ত্রিপুরায় কোন সভ্য এবং দায়িত্বশীল সরকার নেই।

গ্রীয়ারের কথাটুকু শেষ করার আগেই বীরচন্দ্র টি-পয়ে একটি বিরাশি সিক্কার থাবা মেরে বললেন, গ্রীয়ার, তুমি তোমার সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছ । মুখ সামলে কথা বলবে তুমি ।

মাঝখানে উমাকান্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, মহারাজ, আপনি গ্রীয়ার সাহেবের সংগে এভাবে কথা বলতে পারেন না। শত হোক, গ্রীয়ার এখানে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি।

তুই মাঝখানে কথা বলতে আসিস না, উমাকান্ত বাপের পো । বীরচন্দ্র খিঁচিয়ে উঠলেন, যতসব নষ্টের গোড়া হলি তুই । গোপনে গোপনে রিপোর্ট দিয়ে তুই আমার সম্পর্কে ব্রিটিশের মন বিষিয়েছিস । তুই ভেবেছিস, আমি কিছু জানি না, হারামজাদা কোথাকার ।

লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গ্রীয়ার রাগতস্বরে বললেন, মহারাজ, এনাফ ইজ এনাফ । যথেষ্ট হয়েছে । আপনি যেভাবে আমাদের অপদস্থ করলেন তার মূল্য আপনাকে

দিতে হবে । আমরা চলি ।

চলি মানে কি ? যাবে কোথায় ? আমি মাটিতে পুঁতে রাখব তোমাদের দু'জনকে এখানে। কাক-পক্ষীও টেরটি পাবে না, বুঝেছো । মহারাজা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন।

গ্রীয়ার এমনিতে ফর্সা। অপমানিত হওয়ার ফলে তাঁর চোখ মুখ লালে লাল হয়ে গিয়েছে। রেগেমেগে গ্রীয়ার বললেন, আপনি আমাদের মাটিতে পুঁতে ফেলতে চান। হিম্মত থাকলে, পুঁতুন। আমরা বাধা দেব না।

বীরচন্দ্র নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন। মেজাজ ভীষণ চড়ে গিয়েছিল। নিজেকে যথেষ্ট সামলে মহারাজা বললেন, তোমরাই আমাকে আজেবাজে কথা বলে রাগিয়ে দিচ্ছ। তোমাদের আমি মাটিতে পুঁতব না শূলে চড়াব সেটা পরে ভেবে দেখব। তার আগে আমি জানতে চাই, কেন তুমি বললে আমার সরকার সভ্য সরকার নয়। উত্তর দাও।

গ্রীয়ারের হাসি পেল। অতিকষ্টে হাসি চেপে বললেন, মহারাজ, চিটাগাংয়ের ডিভিশনাল কমিশনার লায়েল সাহেব কি আপনাকে চিঠি দিয়ে জানাননি যে, দীর্ঘ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে যেখানে ১৮২৯ ইং সালে ভারতবর্ষ থেকে লর্ড বেন্টিঙ্ক সাহেব আইন করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেছেন, সেখানে এখনও আপনার ত্রিপুরায় দিব্যি সতীদাহ প্রথা চলছে। সতীদাহ হল বারবারাস্ । এটি একটি অসভ্য প্রথা। আপনাকে সতর্ক করে দিয়ে বারবার বলা হয়েছে, আপনি এই বর্বর প্রথা রদ করুন নতুবা আপনি নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনবেন। নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়ছে সেসব।

গ্রীয়ার, তুমি এক অর্বাচীন যুবক। তোমার সংগে আমি সতীদাহ সভ্য কি অসভ্য প্রথা এ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। কেননা আলোচনা করলেও তুমি কিছুই বুঝবে না। বুঝবার জন্য ঘটে যে বুদ্ধি থাকার দরকার তা তোমার নেই। শুধু তোমার কেন, অনেক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরই তা নেই। ইংরেজ রাজ্য শাসনের মধ্যে তোমরা কেবল হৃদয়হীন আইনের মারপ্যাঁচ দেখ। তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলো তো, আইনের জন্য মানুষ নাকি মানুষের জন্য আইন ?

গ্রাম্য সালিশিতে যেমন নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দেবার রেওয়াজ সেরকম মহারাজা প্রশ্নোত্তরের মালা দিয়ে গ্রীয়ারকে বোঝাতে শুরু করলেন, তোমাদের ব্রিটিশদের সংগে আমাদের সনাতন ভারতের তফাৎটা কোথায় জানো তো ? আমি রাজা, আমি দেশ শাসন করি আইন দিয়ে নয়, আমি দেশ শাসন করি ঈশ্বরের নামে ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে। আমাদের ধর্মে স্পষ্ট বলেছে—সতীদাহ একটি ধর্মীয় অনুশাসন। নিজের, দশের এবং দেশের কল্যাণের জন্য সতীদাহ প্রথার দরকার আছে । আমি একজন ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মভীরু রাজা। ধর্মীয় অনুশাসন না মানলে আমি মহাপাতক হবো । মৃত্যুর পর আমার নরকবাস হবে। তুমি তো নিজের চক্ষেই দেখলে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা। যে কোনদিনই আমার ডাক চলে আসতে পারে। যাবার আগে আমি আমার পাপের বোঝা বাড়াতে চাই না।

মহারাজার যুক্তি শুনে গ্রীয়ার হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে না পেরে শুধু বললেন, যদি তাই হয়, তবে আলাদা রোবকারি জারি করে আপিন ত্রিপুরা রাজ্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করলেন কেন ?

কি করবো ? কমিশনার লায়েল একটার পর একটা কড়া চিঠি লিখছে। ভয় দেখাচ্ছে, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সতীদাহ রদ করে দিয়েছি। বীরচন্দ্র দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করলেন।

উমাকান্ত এতক্ষণ দুপক্ষের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। মহারাজার ধমক খেয়ে চুপচাপ বসে নীরবে অপমান হজম করেছেন। এবার সুযোগ আসতেই উমাকান্ত মুখ খুললেন, মহারাজ, আপনি বলছেন ত্রিপুরায় সতীদাহ নিষিদ্ধ করেছেন। অথচ আমি কিছুদিন আগে সোনামুড়া সফরে গিয়েছিলাম । সেখানে কয়েক বছরের মধ্যে পরপর তিন তিনটা সতীদাহ হয়েছে। বুড়মাছেড়ার চরণ সেনাপতির স্ত্রী, ফালিলংছেড়ার গঙ্গামোহন সেনাপতির স্ত্রী বেণীলক্ষ্মী এবং তুইরুপ্পাছেড়ার হান্তারাই চৌধুরী পাড়ার মিলারাম বর্মার স্ত্রী স্বামীর সংগে চিতায় সহমরণে গিয়েছে । অনুসন্ধান করে আমি এও জেনেছি, আপনি নাকি বলেছেন এগুলোকে গোপন রাখতে, যেন ব্রিটিশ সরকার না জানতে পারে ।

একেবারে সুনির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করার ফলে বীরচন্দ্র বেকায়দায় পড়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, উমাকান্ত, তোমাকে একটা কথা বলি ! তুমি এত সফরটফর কর কেন ? অ্যাঁ ।

অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিকেল এজেন্ট হিসেবে এটি আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে মহারাজ। উমাকান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ।

চোপ্ ! কথার ওপর কথা আমার পছন্দ নয়। মহারাজা আবার হঠাৎ রেগে গেলেন। নিজের সমর্থনে বীরচন্দ্র বললেন, ঠিকই আছে। আমিই বলেছি রাজ্যে সতীদাহ নিষেধ আবার আমারই আদেশ কেউ স্বেচ্ছায় সহমরণে গেলে আটকানোর দরকার নেই। ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে।

আশ্চর্য ! গ্রীয়ার বিস্মিত হয়ে বললেন, এটি একটি ডাবল স্ট্যাণ্ডার্ড। এটি নিশ্চয়ই সভ্য এবং দায়িত্বশীল সরকারের কাজ হতে পারে না ।

গ্রীয়ার সাহেব, অত চট করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ো না । বীরচন্দ্র ধীরে সুস্থে বলতে শুরু করলেন, ব্যাপারটা অত সহজ নয় — যতটা সহজ মনে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর একটি বিধবার কি অসহায় শোচনীয় অবস্থা হয়, জানো তুমি ? বিধবাটি যদি ডবকা যুবতী হয়,তাহলে রাতের অন্ধকার নেমে এলেই তার বাড়ীর চারপাশে কেবল ছোঁকছোঁক ফিসফিস। সংসার পাপাচারে ভর্তি হতে আর বাকী থাকে না। মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় জ্বলে না মরলেও কিছুদিনের মধ্যেই পেটে বাচ্চা নিয়ে করবী ফুলের বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া বিধবার অন্য কোন রাস্তা থাকে না। আমি রাজা হয়ে আমার রাজ্যে এই অনাচার কিভাবে সহ্য করি, বলো ? তাছাড়া ভাতারই যদি মরে যায় তবে বিধবাকে ভাত দেবে কে ? তাই আমি মনে করি,

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে কোন সদ্য স্বামীহারা রমণী চিতায় স্বেচ্ছায় উঠে যদি সহমরণে যেতে চায়, তবে তাকে বাধা দেয়া উচিত নয়।

হতাশ হয়ে গ্রীয়ার বললেন, মহারাজ, আপনি ঘড়ির কাঁটাকে পেছনের দিকে ফেরাতে চান। সেটা কি সম্ভব ?

আমি বললে অসম্ভব মনে হয়, তাই না ? বীরচন্দ্র শ্লেষ মিশিয়ে বললেন, লর্ড বেন্টিঙ্কের আইনের বিরোধিতা করেননি কি রাজা রামমোহন রায় ? কই, তখন তো তোমরা কিছু বলো না। শুধু আমার বেলায় যত হম্বিতম্বি। কারণ, আমি তো ক্ষুদ্র ত্রিপুরার ক্ষুদ্র রাজা।

গ্রীয়ার ভীষণ অবাক হলেন। বীরচন্দ্রকে যত ভোলেভালা মনে হচ্ছিল আসলে তা নয়। রাজা রামমোহন রায়কে নিজের পক্ষে টেনে এনেছেন তিনি। এটা ঠিকই, রাজা রামমোহন রায় তখন বেন্টিঙ্কের সতীদাহ প্রথা আইন জারী করে নিষিদ্ধ কবার বিপক্ষে ছিলেন। রামমোহন বলেছিলেন, আইন করার দরকার নেই— লোকের সচেতনতা বাড়িয়ে সংস্কারের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা এমনিতে বন্ধ করা সম্ভব। সারা বাংলাদেশে রামমোহন নবজাগরণের আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করে বলতে চেয়েছিলেন, পরিবর্তনটা ভেতর থেকে আসতে হবে, বাইরে থেকে আইন করে চাপিয়ে দিলে তা দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। কিন্তু সেদিনের বাংলার সংগে ত্রিপুরার মিল কোথায়? ত্রিপুরায় না আছে নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের ঢেউ, না আছে সংস্কারের জন্য কোন আন্দোলনের তোড়জোড়।

বাস্তবকে বোঝবার চেষ্টা করো। বীরচন্দ্র নিজের সমর্থনে আরও যুক্তি সাজাতে সচেষ্ট হলেন, আইন করে বা বড় বড় কথার লেকচার মেরে কিছু হয় না। মেয়েদের সহমরণের জন্য তাদের নিরাপত্তাহীনতাই দায়ী। সামাজিক নিরাপত্তা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। যতদিন না তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে, ততদিন লোচ্চা বদমায়েশদের হাতে নারীত্বের বিনাশের চেয়ে আগুনে পুড়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

আলোচনা চলাকালে বৈকালিক জলখাবার এল। রূপোর রেকাবিতে থরে থরে সাজানো ফলমূল মিষ্টি। পরে গ্রীয়ার ও উমাকান্তর জন্য এল ধূমায়িত সুগন্ধি চা আর মহারাজার জন্য ঢাউস একটি পাথরের গেলাস ভর্তি বেলের সরবত। বীরচন্দ্র যখন-তখন বেলের সরবত খান, এটি খেলে পিত্ত ঠাণ্ডা থাকে। বেশ কিছুদিন ধরে মহারাজার শরীরের অভ্যন্তরে পিত্ত, যকৃৎ এবং বৃক্কের ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন ঘটছে। বীরচন্দ্রের পা ফোলা ফোলা, চোখের নীচটাও ফোলা। অল্পেতে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন, শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় জানান না দিয়ে।

বীরচন্দ্র একটানে ঢকঢক করে পুরো বেলের সরবতটি শেষ করে ঠকাস করে গ্লাসটি টেবিলে রেখে বললেন, আর তোমার কিছু বলার আছে গ্রীয়ার সাহেব? থাকলে বলো, সবকিছুর আজ শেষ বেশ হয়ে যাক।

মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করবেন। গ্রীয়ার চুকচুক করে শব্দ তুলে বললেন, আমার নিজের

কিছুই বলার নেই ।এগুলো সবই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বক্তব্য ।

ধমকে উঠলেন বীরচন্দ্র, একবার বলি নি, ধানাইপানাই করো না। সোজাসুজি বল সব। আমি ন্যাকামি পছন্দ করি না ।

কিছুটা আহত হলেও গ্রীয়ার তা প্রকাশ না করে বললেন, কি বলব, বলুন ।একি একটা দু'টো নাকি এ তো অসংখ্য। যেমন ধরুন, আপনি আপনার রাজ কর্মচারীদের প্রতি মাসে মাইনে দিতে পারেন না, প্রচুর বকেয়া পড়ে আছে পাওনা, অথচ আমোদপ্রমোদে আপনি দেদার টাকা ওড়াচ্ছেন ।এটা তো ঠিক নয় ।

আমি যদি টাকা ওড়াই, তাহলে কার কি? আমি তো অন্য কারোর বাপের টাকা ওড়াচ্ছি না । মহারাজার মানসম্মানে লাগতেই তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, আমার কর্মচারীরা তোমার কাছে নালিশ করেছে নাকি ? আমি ওদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব । এদের শিক্ষা নেই যোগ্যতা নেই, পথে পথে পোড়া বিড়ির টুকরো খাওয়ার কথা ওদের । সে জায়গায় আমি তাদের মন্ত্রী বানিয়েছি, জজ বানিয়েছি, আল হাজারী বানিয়েছি, কর্ণেল বানিয়েছি, এখন ওরা বলে কিনা আমি তাদের মাইনে দিই না। সে টাকা দিয়ে আমি ফূর্তি করছি ।

মহারাজ, আপনি অহেতুক রেগে যাচ্ছেন । গ্রীয়ার শান্ত কণ্ঠে বললেন, এটা তো ঘটনা। আপনার এই ছোট্ট রাজ্যে এগার লক্ষ টাকা ঘাটতি। রাজ্যের খুব একটা রাজস্ব নেই, অথচ ব্যয়ের কোন মা বাপও নেই । যখন তখন বিয়ে শাদির নামে রাজকোষ শূন্য করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা কি আপনার পক্ষে মানায় ? আমি শুনেছি আপনি নাকি আপনার এক কন্যার বিয়েতে জাঁকজমক করে লক্ষ টাকা খরচ করেছেন, যে এখনও ভালো করে হাঁটতে শেখেনি। হামাগুড়ি দেয়।

অভিযোগের বহর দেখে মহারাজা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, গ্রীয়ার, তোমরা আমাকে পেয়েছোটা কি ? তোমার কমিশনার সাহেব আমাকে জানাল, আপনার ন'টি পুত্র এবং ষোলটি কন্যা । প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে বিয়ে দিলে এক লক্ষ টাকা করে মোট পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ ।বরং আপনি একটা কাজ করুন, একসঙ্গে কয়েকজনকে বিয়ে দিন তাতে অর্থের সাশ্রয় হবে । তোমার সাহেবের পরামর্শটা আমার খুব মনে ধরেছে। আমি তাই দু'দুক্ষেপে অনেকগুলো পুত্র এবং কন্যার বিয়ে দিয়ে দিলাম। তোমাদের পরামর্শমতই তো পাইকারী বিয়ে হল ।তাতে যদি কোন রাজকন্যার হামাগুড়ি দেবার বয়সে অন্যদের সাথে একই সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় তাতে ক্ষতিটা কি হল ? মহারাণী ভিক্টোরিয়া তো এখনও বাল্যবিবাহ এদেশে নিষিদ্ধ করেননি। তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হল কোথায় ?

গ্রীয়ারের মুখে কোন রা নেই, তিনি উমাকান্তর দিকে তাকালেন ।উমাকান্ত মহারাজকে আড়াল করে নিঃশব্দে হাসলেন।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য গ্রীয়ার বললেন, বাল্যবিবাহের কথা থাক ।আমরা শুনেছি, মাত্র কিছুদিন আগে আপনি নিজে একটি নতুন বিয়ে করেছেন। ঐ বিয়ে উপলক্ষে একমাস ধরে

ভুরিভোজের ব্যবস্থা ছিল। রাজ্যের লোকেরা যখন-তখন পাত পেড়ে পেট পুরে খেয়ে যেত। এ তো অপচয়। তাছাড়া আপনার শরীর ভালো নেই, বয়সও হয়েছে। আপনার আবার বিয়ে করার কি দরকার ছিল এখন?

বীরচন্দ্র আড়চোখে উমাকান্তকে একবার দেখে নিয়ে গ্রীয়ারের চোখে চোখ রেখে বললেন, শোনো, আমার রাজ্যের গরীব সরীব লোক, তারা দুবেলা ভালো করে খেতে পায় না। তাদের মহারাজার বিয়ে উপলক্ষ্যে তারা যদি কয়েকটা দিন ভালোমন্দ খেতে পায় তবে তাতে দোষের কি আছে আমি তো বুঝি না। এই যে আমার রাজপ্রাসাদের সামনে বিশাল দীঘি — এটার কি দরকার? তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে মনে হবে, এত বড় দীঘির প্রয়োজন নেই। একটা ছোটখাটো হলেই তো তার জল দিয়ে রাজবাড়ীর লোকজনের স্নান হাগামুতা সব হয়ে যায়। শুধু শুধু দীঘি বানিয়ে টাকার অপচয় করার মানে হয় না। কিন্তু তোমাদের নিরেট মাথায় যেটা ঢোকে না সেটা হল, দীঘি এমনি বিনা কারণে কাটা হয় না। দেশে যখন অভাব অনটন বেড়ে যায়, লোকের কাজ নেই, তাই আয় নেই তখন একটা দীঘি কেটে মাটিয়ালদের কাজ এবং আয়ের সংস্থান করে দিই। এটা অপচয় নয়, এটা জরুরী কাজ। তাছাড়া শীতল জলের দীর্ঘ জলাশয়ের একটা নৈসর্গিক সৌন্দর্য আছে। যা টাকা দিয়ে মাপা যায় না। তোমরা এসব বুঝবে না। তোমাদের সংগে কথা বলা বৃথা।

গ্রীয়ার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে বীরচন্দ্র বলে উঠলেন, তুমি জানতে চেয়েছো, আমি আবার এই বয়সে বিয়ে করতে গেলাম কেন? তোমার অবগতির জন্য বলি, রাজাদের কোন নির্দিষ্ট বিয়ের বয়স নেই। যখনই তাঁরা মনে করবেন যে বিয়ে করা দরকার তখনই তাঁরা বিয়ে করতে পারেন। আমার বাবাও তাই করেছেন। আমার ঠাকুর্দাও তাই করেছেন। আমি ব্যতিক্রম হতে পারি না। গ্রীয়ার, তুমি বয়সে আমার পুত্রের সমান। পুত্রবয়সী তোমার সঙ্গে আমি আমার বিবাহ সম্পর্কিত কোন আলোচনা করতে চাই না। এটা আমার সংস্কার এবং রুচিতে বাধে।

দীর্ঘক্ষণ অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। এখন খানিক বিরতি। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ এবং আমোদ প্রমোদে বেহিসেবী খরচের জন্য যে অভিযোগগুলো তোলা হয়েছিল সেগুলোর যুতসই জবাব দিয়েছেন মহারাজা। আত্মসন্তুষ্টি এবং তৃপ্তির আবেশে বীরচন্দ্র নিজের গোঁফে তা দিতে লাগলেন।

তিন

গ্রীয়ার বুঝলেন বীরচন্দ্রের সংগে তর্ক করা অর্থহীন। এতে সময় নষ্ট, কাজের কাজ কিছুই এগোচ্ছে না। গ্রীয়ার তাই আর কালক্ষেপ না করে সরাসরি আসল প্রশ্নে চলে এলেন। যদিও আসল প্রসঙ্গে আসার আগে একটু ঘুরিয়ে প্রস্তাবটি পাড়লেন, মহারাজ, আপনার বয়স এখন প্রায় ষাটের কাছাকাছি। আপনার পূর্বপুরুষেরা কেউই এত দীর্ঘ আয়ু পান নি। সবাই

প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে পরলোক গমন করেছেন। অথচ আপনি রাজত্বই করছেন দীর্ঘ চার দশক ধরে। আপনার বড়পুত্র যুবরাজ রাধাকিশোরের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর।

বীরচন্দ্র বুঝতে পারছেন না গ্রীয়ার আলোচনাটি কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে। বেশ বিরক্ত হয়ে চোখ মুখ কুঁচকে মহারাজা বললেন, আমি কি জানি না আমার বয়স কত আর আমার বড় ছেলের কত বয়স ? এসব কথা বলার মানে কি ?

মানে কিছু নয়। যে কথাটি বলার চেষ্টা করছি তা হল যুবরাজ রাধাকিশোরের অনেক বয়স হয়ে গেল, অথচ তিনি আদৌ রাজা হতে পারবেন কিনা সেটাই এখনও স্পষ্ট নয়। গ্রীয়ার পুরো বক্তব্যটি পেশ করার আগে একটু থামলেন।

গ্রীয়ার তুমি কি বলতে চাইছো আমি বুঝতে পারছি না। তোমরা কি চাইছো, আমি কেন মরছি না ? কেন আমি বেঁচে আছি ? এটা কি তোমার কথা, নাকি যুবরাজ রাধাকিশোরেরও মনের কথা ? বলতে বলতে মহারাজা উদাস হয়ে গেলেন। বিষণ্ণ উদাসী গলায় বললেন, গ্রীয়ার আমি জানি এই রাজপ্রাসাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে চাইছে, আমি যেন তাড়াতাড়ি মরে যাই। জীবন বড় অদ্ভুত, গ্রীয়ার। আমার শোণিতের ধারা বইছে যাদের শিরা উপশিরায়, যারা আমার আত্মজ তারা প্রতিক্ষণ আমার মৃত্যু কামনা করে। অবশ্য এতে আমি আশ্চর্য নই।

গ্রীয়ার সমবেদনার সুরে আস্তে আস্তে বললেন, মহারাজ, দরবারে সবাই জানে, যুবরাজ রাধাকিশোর এখন আর আপনার স্নেহভাজন নয়। বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রকে আপনি কিছুদিন আস্কারা দিয়েছিলেন। সবাই তখন ভেবেছে, আপনি হয়ত একসময় রাজ্যভার সমরেন্দ্রর হাতে তুলে দেবেন। হালে দেখা যাচ্ছে, আপনার তৃতীয় ঈশ্বরী মনোমোহিনীর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রকে অতিরিক্ত স্নেহ করতে শুরু করেছেন। আপনি মুখে কিছু বলছেন না বটে, কিন্তু আপনার আচার আচরণে মনে হচ্ছে আপনি বারবার মন বদলাচ্ছেন। এর ফলে রাজ্যের প্রশাসনে অস্থিরতা বাড়ছে। রাধাকিশোরকে সমর্থন যারা করে তাদেরকে একে একে আপনি উচ্চপদগুলো থেকে হটিয়ে দিয়েছেন। সমরেন্দ্রকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। নাবালক জ্যোতিরিন্দ্রকে কোলে করে নিয়ে রাজদরবারে আপনি বসেন। এসবে জটিলতা বাড়ছে, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আসল কথা হল, রাজদরবারে এমন কেউ নেই যে আপনাকে সৎপরামর্শ দিতে পারে, তাদের আপনি ঝেঁটিয়ে রাজ্য থেকে তাড়িয়েছেন। তাঁবেদার এবং মোসাহেবেরা আপনাকে ঘিরে আছে এখন।

তুমি ঠিকই বলেছো। তবে পুরোটা ঠিক বলোনি। তুমি যাদেরকে তাঁবেদার মোসাহেব বলছো, এরা তা নয়। এরা প্রত্যেকে হল ষড়যন্ত্রী। সময় এবং সুযোগ এলেই এদের আসল রূপটি বেরিয়ে পড়ে। বীরচন্দ্র ক্লান্তিতে কুর্সির ওপরে পা তুলে আরাম করে বসলেন। বললেন, আমার বড় ঈশ্বরী ভানুমতীর মৃত্যুর পর চার মাস আমি বৃন্দাবনে ধর্মকর্ম করতে

গিয়েছিলাম। যাবার আগে রাজ্য চালাবার জন্য আমার অনুপস্থিতিতে একটা প্রশাসনিক সচিব সমিতি বানিয়ে দিয়েছিলাম। যুবরাজ রাধাকিশোর তার সভাপতি, ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মা ছিল রাজমন্ত্রী আর রাজা মুকুন্দ রায়, উজীর গোপীকৃষ্ণ দেববর্মা, দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত ও নায়েব দেওয়ান হরিচরণ নন্দী ছিল সচিব সমিতির সদস্য। স্ত্রীর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করে যখন দীর্ঘদিন বাদে ফিরে এসেছি, তখন দেখি আমার ফেরাতে সবাই অখুশী। আর অন্যদিকে রাধাকিশোরের নামযশ। রাধাকিশোরের শাসনকালে নাকি প্রজাগণ সুখী। রাজ্যের নাকি রাজস্ব বেড়েছে। দেশে নাকি সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বীরচন্দ্র নিজেই থেমে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে বলতে তাঁর হাঁফ ধরে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বিশ্রাম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, তোমাকে বলতে বাধা নেই, গ্রীয়ার। রাধাকিশোরের প্রশংসা শুনে ঈর্ষায় আমার বুক জ্বলে গেল। যুবরাজ রাধাকিশোর আমারই পুত্র, তবু তার সুখ্যাতি আমার সহ্য হচ্ছিল না। কেন, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। আমি ফিরে এসে প্রথম যে কাজটা করেছি তা হল, সচিব সমিতি ভেঙ্গে দিয়েছি। নূতন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেছি তাতে রাধাকিশোরকে রাখি নি। অনেকে অনেক কথা আমাকে বলেছে পক্ষে-বিপক্ষে। আমার মতে রাজ্য শাসন আর অপত্য স্নেহ দু'টি ভিন্ন ধারা। দু'টিকে এক সংগে রক্ষা করা যায় না।

বীরচন্দ্র এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ। মনটা আকাশের মত উদার। আবার যখনই মনে হবে কারোর কাছ থেকে ষড়যন্ত্র রাজপাট খোয়ানোর সম্ভাবনা আসছে তার প্রতি তিনি নির্মম। সে নিজের ছেলেই হোক বা যে-ই হোক। জীবিত থাকাকালে নিজের ক্ষমতা বা অধিকার একচুলও কাউকে দেবার জন্য মন থেকে সায় পান না তিনি। বীরচন্দ্র অনুকম্পা করে যাকে যা দেবেন তাই নিয়ে তাকে খুশী থাকতে হবে। ভয় দেখিয়ে বা ঘোঁট পাকিয়ে কেউ যদি কিছু হাতাতে চায় তবে তার কপালে দুঃখ আছে। বীরচন্দ্র যখন প্রিভি কাউন্সিলের রায় মোতাবেক আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন যৌবরাজ্যে কাকে অভিষিক্ত করা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অনেকে ভেবেছিলেন বীরচন্দ্রের দাদা স্বর্গত মহারাজা ঈশানচন্দ্রের নাবালক পুত্র নবদ্বীপচন্দ্রকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করা হবে। এই ধারণার পেছনে অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। ঈশানচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রেরা কেউ সিংহাসনে বসার উপযুক্ত নয় বলেই বীরচন্দ্র বিতর্কিত এক রোবকারি অনুসারে নিজেই সিংহাসন দখল করে নেন।

এই বিষয়টি আদালতে গড়ায়। বীরচন্দ্রের সিংহাসনে উত্তরাধিকারের ঘোষণাপত্র যাতে ঈশানচন্দ্র সই করেছিলেন বলে দাবী করা হয়েছিল, সেটিই জাল বলে মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় বীরচন্দ্র জিতেছিলেন এবং যারা মামলায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদের তিনি ক্ষমা করেন নি। প্রভু বিপিনবিহারী গোস্বামী, যাঁর কারসাজিতে বীরচন্দ্রের সিংহাসন লাভ মসৃণ হয়েছিল, সিংহাসন প্রাপ্তির পর তাঁকেই তিনি কারারুদ্ধ করে রেখে দেন দীর্ঘকাল। কারার অন্তরালেই প্রভু বিপিনবিহারী গোস্বামী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অস্থায়ীভাবে বীরচন্দ্র

রাজত্বভার গ্রহণ করেন ১৮৬২ইং সালে। তারপর ১৮৭০ ইং সালের ৯ই মার্চ চিটাগাংয়ের তদানীন্তন কমিশনার ব্রাউন সাহেবের উপস্থিতিতে ১২৮টি স্বর্ণমুদ্রা নজরানা দিয়ে আইনানুগ রাজা হিসেবে ঘোষিত হন। রাজা হয়েই তিনি তাঁর নিজ পুত্র রাধাকিশোরকে তড়িঘড়ি যুবরাজ পদে বৃত করেন। নবদ্বীপচন্দ্রকে যারা যুবরাজ করার জন্য প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে চেষ্টা করছিল, তাদের তিনি একে একে শায়েস্তা করেছেন। এমন কি নবদ্বীপচন্দ্রকে এক বছর তিনমাস গৃহবন্দী করে রেখেছেন। কেউ কিছু জানতে পারেনি। কি করে নীরবে পথের কাঁটা সরাতে হয় বীরচন্দ্র তা ভালোই জানেন। তিনি জানেন মুঠোর চেয়ে আমের আঁটি বড় হয়ে গেলেই মুশকিল, তখন আম চিপে রস দিয়ে ফলাহার করা যায় না।

একসময় তিনি ভেবেছিলেন এবং এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল যে যুবরাজ রাধাকিশোর পরবর্তী মহারাজা হবেন। রাধাকিশোর বিবেচক এবং বয়স্ক। কিন্তু তাঁর তর সইছিল না। রাজদরবারের ভিতর একটি ষড়যন্ত্রের চক্রের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যান। ক্ষমতার লবিটি স্পষ্টতই রাধাকিশোরের দিকে ঝুঁকে যায়। তাতে বীরচন্দ্র আশংকিত হয়ে ওঠেন। তাছাড়া জীবিত থাকাকালীন বড় ঈশ্বরী ভানুমতী তাঁর পুত্র সমরেন্দ্রকে সিংহাসনে বসাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। বীরচন্দ্র তখন প্রচ্ছন্নভাবে রাধাকিশোরের পশ্চাতে সমরেন্দ্রর হিতৈষীদের মদত দিয়েছেন। ভানুমতীর পরলোক গমনের পর সমরেন্দ্র হীনবল হয়ে পড়েছেন। এখন তৃতীয় ঈশ্বরী বীরচন্দ্রের যুবতী ভার্যা মনোমোহিনীর দাপটের কাল। বীরচন্দ্র যখন যেখানে যান জ্যোতিরিন্দ্রকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়া হয়। শিশু জ্যোতিরিন্দ্র বৃদ্ধ বীরচন্দ্রের কোলে পিঠে অষ্টপ্রহর লেপ্টে থাকে। ইদানীং জ্যোতিরিন্দ্রর মায়াময় মুখ এবং আধো আধো বুলিতে বীরচন্দ্র কাবু হয়ে পড়েছেন। যৌবরাজ্যের ব্যাপারের জটটি এখনই তিনি ছাড়াতে চান না, চলুক যেমন চলছে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘ নীরবতা ভেঙ্গে গ্রীয়ারবললেন, মহারাজ, এভাবে চলে না। ত্রিপুরাতে সত্যি বলতে কোন প্রশাসন নেই। এখানে নেই কোন রুল অব ল। আপনার কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ছেয়ে গিয়েছে। রাধাকিশোর হতাশায় ভুগছেন। খুবই গোপনে তিনি গোষ্ঠীবাজী করছেন। আপনার অন্য পুত্র সমরেন্দ্র কলকাতায় গিয়ে লর্ড ডাফরিনের স্ত্রীর মাধ্যমে ত্রিপুরার সিংহাসন দখলের কলকাঠি নাড়ছেন। তাছাড়া আপনার স্ত্রী মহারাণী মনোমোহনীর মতামতকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা আপনার নেই বলেই মনে হয়। এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য দু'টি পথ মাত্র খোলা আছে। আপনি রাজি থাকলে আমরা এখন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

বীরচন্দ্র কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। তাঁকে ভীষণ অবসন্ন দেখাচ্ছে। গ্রীয়ার পকেট থেকে অন্য একটা সীলমোহর দেয়া লেফাফা বের করলেন। মহারাজার সামনে খামটি ছিঁড়ে ভাঁজ করা কাগজটি খুলে পেতে ধরে বললেন, আমার ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মনে করছে ত্রিপুরার যা বর্তমান পরিস্থিতি তাতে অনতিবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন। হস্তক্ষেপ দু'ভাবে হতে পারে। একটি মৃদু বা মাইল্ড ধরনের আর অন্যটি ষ্ট্রং। গ্রীয়ার কাগজটি থেকে চোখ তুলে

বীরচন্দ্রের দিকে তাকালেন। মহারাজার ভাবলেশহীন মুখ। গ্রীয়ার আলতো করে কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, ইয়োর হাইনেস। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এখন যা বলব এগুলো আমার বক্তব্য নয়। এগুলো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্যারামাউন্ট পাওয়ারের বক্তব্য। প্রথম প্রস্তাবটি হল আপনি সিংহাসন থেকে স্বাস্থ্যের কারণে নেমে দাঁড়াবেন। যুবরাজ রাধাকিশোরকে রিজেন্ট বলে ঘোষণা করা হবে। রিজেন্ট যুবরাজ পার্বত্য ত্রিপুরার জন্য একজন মিনিস্টার এবং চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর জন্য একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করবেন। যিনি মিনিস্টার হবেন তিনি বাঙালী হবেন তবে ঢাকা বা বাংলার পূর্ব অঞ্চলের লোক হতে পারবেন না। আর যিনি জমিদারীতে ম্যানেজার পদে যোগ দেবেন তাকে ইউরোপীয়ান হতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব দিয়ে রাজ পরিবারের ঠাকুরদের ব্যয়ভার নির্বাহ করা হবে। চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর আয় থেকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি প্রদেয় কর ইত্যাদি মেটানো হবে। তারপর উদ্বৃত্ত যা থাকবে তা দিয়ে রাজার আগেকার ঋণ এবং বণের দায়ভার ক্রমশ হ্রাস করার চেষ্টা করা হবে। পদত্যাগী রাজা হিসেবে আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন স্যুয়েটেবল অ্যালাউন্স পাবেন। পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য এবং চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর সমস্ত শাসন এবং ভোগের অধিকার রিজেন্ট যুবরাজের হস্তে অর্পিত থাকবে।

গ্রীয়ার থামলেন। থেমে বীরচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তাঁর মতিগতি বুঝবার চেষ্টা করলেন। মহারাজা আগের মতই নির্বিকার রয়েছেন। আবার বলতে শুরু করলেন গ্রীয়ার, এই এক্ষুণি যে প্রস্তাবটির কথা বললাম এ ব্যাপারে আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন। নইলে আমি দ্বিতীয় প্রপোজালটিতে চলে যাচ্ছি। এটি অবশ্য খুবই সিম্পল। এতে বলা হয়েছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এবং উন্নতির বিঘ্ন হওয়া বিধায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আগামী পাঁচ বছরের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য এবং চাকলা রোশনাবাদের সমস্ত আর্থিক প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব নিজহস্তে তুলে নেবে। খুব দুঃখের যে, এটি সরাসরি হস্তক্ষেপেরই নামান্তর। তাছাড়া সরকারের আরো অভিপ্রায়, পার্বত্য ত্রিপুরার জন্য একজন অ্যাডমিনিষ্ট্র্যাটর এবং জমিদারীর জন্য একজন ম্যানেজার নিয়োগ করবেন। তারা দু'জনই সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং জবাবদিহি করবে, অন্য কোথাও নয়। আপনি এবং আপনার পরিবারের সদস্যরা যথাযথ অ্যালাউন্স পাবেন। পাঁচ বছর পরে অবস্থার উন্নতি হলে, আবার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া হবে। এই দু'টি প্রস্তাবের মধ্যে আপনি কোনটিতে সম্মত আছেন আমাকে জানিয়ে দিন। আমি কুমিল্লায় পৌঁছে চিটাগাংয়ের কমিশনারকে জানিয়ে দেব। তিনি কলকাতায় ছোটলাট সাহেব টমসনকে সবটা অবহিত করবেন এবং সেভাবে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বীরচন্দ্র যেমন নির্বিকার ছিলেন তেমনি নির্বিকার রইলেন। কোন সন্দেহ নেই, দু'টি প্রস্তাবই সমান অবমাননাকর। এরকম কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি আগে কখনও বীরচন্দ্র হন নি। ঝড়ঝঞ্ঝা এসেছে অনেক, তবে তিনি সেগুলো সাফল্যের সঙ্গে পার হয়ে এসেছেন। এবার সাফল্য নেই — সবটাই ব্যর্থতা। তবে দু'টোর মধ্যে কোনটা কম ক্ষতিকর কোনটা

বেশী তাকে একটা বাছতেহবে। তিনি যদি রিজেন্ট প্রস্তাবটি মেনে নেন তবে ক্ষমতা রাজ্যের মধ্যেই থাকে। তাঁরই পুত্র রাধাকিশোর রাজ্যভার পাচ্ছেন যা বীরচন্দ্র নিজেও একসময় চেয়েছিলেন। স্নেহশীল বাবা হিসেবে বীরচন্দ্রের এই প্রস্তাবেই সম্মত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আর অন্য প্রস্তাবটি স্বাধীন ত্রিপুরার স্বাভিমানের সঙ্গে একেবারেই মানায় না। তবে এই প্রস্তাবে বলা আছে ক্ষমতা আবার বীরচন্দ্রের কাছেই ফিরে আসবে। বীরচন্দ্র কি এতদিন বাঁচবেন ? ক্ষমতা আস্বাদন এবং অপত্যস্নেহ দু'টি দুই ধারা। বীরচন্দ্র তাঁর দীর্ঘ জীবনে কখনও দু'টি ধারাকে মেলাতে পারেন নি।

চোখ খুলে তাকালেন বীরচন্দ্র। ভাবলেশহীন তাঁর মুখ। হঠাৎ চীৎকার করে বীরচন্দ্র ডাকলেন, মহিম, মহিম। মহিম দৌড়ে ছুটে এলে বললেন, যা আমার মসিপাত্র আর পাখের কলমটা নিয়ে আয়। সঙ্গে সীলমোহরটা নিয়ে আসিস। সই সাবুত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত হল, মহারাজা বীরচন্দ্র এখন লেফটেনান্ট গভর্নর টমসনের এক কপি চিঠির গায়েই নিজের সম্মতি জানিয়ে সই করে দেবেন। পরে সমস্ত প্রেক্ষাপট বিস্তারিত বর্ণনা করে আসল চিঠিটি পত্রবাহকের মাধ্যমে মহারাজা কুমিল্লায় গ্রীয়ারের কাছে পাঠাবেন।

মহারাজা গ্রীয়ার এবং উমাকান্তকে অবাক করে দিয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাবটির পক্ষে সই করে দিলেন। পাঁচ বছরের জন্য তিনি পদত্যাগ করতে রাজি আছেন। নিজের পুত্র রাধাকিশোরকে রিজেন্ট যুবরাজ পদে আসীন করার বিপক্ষে তিনি। গ্রীয়ার কাগজটা সন্তর্পণে ভাঁজ করে খামে পুরে যত্নে পকেটে ভরে রাখলেন। তারপর নিচু হয়ে মহারাজার ডান হাতে চুম্বন করে বললেন, গুড বাই, ইয়োর হাইনেস। মে গড ব্লেস ইউ।

উমাকান্ত ঝুঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চেষ্টা করলে মহারাজা বললেন, থাক, থাক। হয়েছে, প্রণাম লাগবে না। তোমরা রাগ করো না। তোমাদের বকেছি। আসলে বুড়ো হয়েছি তো, মেজাজটাকে সামলাতে পারি না।

উমাকান্ত আর গ্রীয়ার চলে গেলে বীরচন্দ্র কুর্সি থেকে উঠে কদম্বগাছের ডালে ঝোলানো দোলনায় গিয়ে বসলেন। কাল সারারাত এখানে ঝুলনোৎসব হয়েছে। আনন্দানুষ্ঠানের সাক্ষী এখনও সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। টমসনের কাগজে দস্তখত করার পর নিজেকে খুবই হালকা এবং ভারহীন মনে হচ্ছে। মাথা থেকে মুকুট খুলে দোলনার পাশে রাখলেন তিনি। মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলতে দুলতে খুব আমেজ আসছে। কাল রাতে ঝুলনটা ঠিক জমে নি। টমসনের খবরটা আসতেই সুর ঝংকারের তারটি যেন ছিঁড়ে যায়। মন কখনও বিক্ষিপ্ত হলে কিছুতেই আর জমে ওঠে না। বীরচন্দ্রের মনটি এখন বেশ ফুরফুরে। আজকে আবার ঝুলনোৎসব করলে মন্দ হয় না। মহারাজা আদেশ করলেই মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু জোগাড়যন্ত্র হয়ে যাবে। রাজ পরিবারের সবাই প্রায় মুখিয়েই থাকে। একটা বাহানা পেলেই হল। কম বয়সী রাণীগুলোর খলবল বেশী। দোলনা থেকেই বীরচন্দ্র দেখতে পাচ্ছেন অন্তঃপুরের পর্দা আর খসখসের আড়াল থেকে রাণীরা উঁকিঝুঁকি মেরে মহারাজাকে দেখছেন। আজকাল কি

যে হয়েছে বীরচন্দ্রের, কোলাহল ঠমক ঠামক আর ভাল লাগে না। একা থাকতেই তাঁর বেশী পছন্দ। কাল ঝুলনে নৃত্যগীতের জন্য মহারাজ বেশ কয়েকটি গান লিখেছিলেন। সুরও দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। হঠাৎ মধ্যপথে আসর ভেঙে যাওয়ায় সব গানগুলো গাওয়া হয় নি।

নিজেরই রচনা একটি ঝুলনসঙ্গীত বারেবারে মনে পড়ছে মহারাজার এখন। গানটা বীরচন্দ্রের মনের এখনকার অশান্তি এবং দোলাচলের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। মন এবং শরীর সংসারের টানাপোড়েনে যখনই উদ্বিগ্ন এবং অশান্ত হয়েছে, বীরচন্দ্র নিজেকে তখন শান্তির সন্ধানে ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন।

বীরচন্দ্র দোলনায় দুলতে দুলতে সুর করে নিজের লেখা ঝুলন গীতটি গাইতে শুরু করলেন----

রাধাশ্যাম,

পাঁজরে বিষের জ্বালা হিয়ায় অনল হে
ঝলকে ঝলকে উঠে জ্বলে,
উঠিতে পড়িয়া যাই পদ মোর বাঁধা নাথ
বিষয়ের বিষম শিকলে।
কাটি এ করম ডোর বজরের বাঁধ হে
বীরচন্দ্র দাসে রাখো পায়,
যে কদিন বাঁচি আর শ্রীবৃন্দা-বিপিনে নাথ
থাকি যেন যুগল সেবায়।।

গাইতে গাইতে তাঁর চোখে জল চলে এল। তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন একাকী।

চার

কলকাতা এক আজব জায়গা। লোকে বলে, খুঁজলে নাকি এখানে বাঘের দুধও মেলে। হয়ত মেলে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও একটি ঠিকানা না পেয়ে মহিমের মেজাজ এখন তিরিক্ষি। শেয়ালদা স্টেশানে নেমে মহিম সেই যে এক নং অক্রুর দত্ত লেন বাড়ীটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এখনও খুঁজেই চলেছেন। ঠিকানাটার ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারেননি। কলকাতা মহিমের খুব একটা অচেনা জায়গা নয়। ছোটবেলায় এখানে পড়াশুনো করেছেন, মোটামুটি তিনি এখানকার রাস্তাঘাট চেনেন। তবে কলকাতা যে দ্রুত হারে বদলাচ্ছে, হু হু করে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়ছে, তাতে কারোর পক্ষে খেই ধরে রাখা মুস্কিল। রোজই নূতন নূতন বাড়ী মাথা তুলছে, কর্পোরেশান রাস্তা বানাচ্ছে, পার্ক বানাচ্ছে। চেনা কলকাতা তাই অচেনা ঠেকে।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটের ধারেকাছেই অক্রুর দত্ত লেন।অনেক খুঁজেটুজে ওয়েলিংটন স্ট্রীট পেয়ে মহিম খানিকটা নিশ্চিত হলেন।আরও খানিকটা খোঁজাখুঁজি করে অক্রুর দত্ত লেনও পেলেন একসময়। তবে এখানকার বাড়ীর নম্বরগুলো খুবই এলোপাতারি। ছাব্বিশের পাশের বাড়ীর নাম্বার হল বিরানব্বই। খুবই রহস্যময় ব্যাপার। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রায় অসাধ্য। বাড়ীগুলোর অবস্থানের মত কলকাতার মানুষদেরও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। গরীবের চালাঘরের পাশে ধনীর বিশাল অট্টালিকা। সাধুসন্ত ভালোমানুষের পাশের বাড়ীতেই থাকে ফেরেববাজেরা। মহিমের এগুলো অজানা নয়। তবে অনেকদিন বাদে বাদে কলকাতায় এলে সবারই একটা 'হারিয়ে গেছি হারিয়ে গেছি' ভাবের উদয় হয়।

অবশেষে এক নম্বর অক্রুর দত্ত বাড়ীটি যখন পাওয়া গেল, তখন পাক্কা দ্বিপ্রহর। ঘর্মাক্ত কলেবরে মহিম হেঁটে সোজা দোতলায় উঠে গেলেন। ত্রিপুরার প্রাক্তন দেওয়ান শম্ভু মুখার্জী বিছানায় শুয়ে আছেন।তাঁকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, তাঁর মুখে দিনকয়েকের না কামানো খোঁচাখোঁচা দাড়ি। বিছানার অন্যপাশে মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছেন একজন। সম্ভবত তিনি ডাক্তার, তাঁর গলায় ঝুলছে স্টেথোস্কোপ। ডাক্তারবাবু মনে হয় খুব রাশভারী, নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে তিনি মহিমকে এক পলক দেখে নিলেন। তাঁর আর কোন ভাবান্তর হলো না।

শম্ভু মুখুজ্যে মহিমকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, কি হে, ঠাকুর-পো। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, উদয় হলে যে! তোমরা কেমন আছো? তোমার বাবা কেমন আছেন? মহারাজার শরীর মন কুশল তো?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে শম্ভু মুখুজ্যে থামলেন। এতক্ষণ ঘরে একটা গুমোটভাব ছিল। মুহূর্তের মধ্যে দমকা হাওয়ায় সমস্ত আবহাওয়াটাই বদলে গেল। শম্ভুবাবু বিছানায় উঠে বসলেন। খাট থেকে পা নামিয়ে পা দোলাতে লাগলেন। ত্রিপুরা থেকে লোক এসেছে, এখন আর অষুধ খাওয়ার দরকার হবে না। জ্বর এখন নিজে থেকেই পালাবে। ত্রিপুরার ব্যাপারই আলাদা। মহিম ত্রিপুরা থেকে একরাশ ফুরফুরে হাওয়া নিয়ে এসেছে সাথে করে।

শম্ভু মুখুজ্যে ত্রিপুরার দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু সেখানে মতান্তর হওয়ায় চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। দেওয়ান হিসেবে কিছু ভাল কাজ করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মহারাজা বীরচন্দ্রের চারপাশের দুষ্টচক্র তাঁকে তা করতে দেয়নি। পদে পদে তারা তাঁকে হেনস্তা করেছে। যাঁর ন্যূনতম আত্মসম্মানবোধ আছে তাঁর পক্ষে আগরতলায় কাজ করা কঠিন। শম্ভু মুখুজ্যে চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেছেন। মহারাজা বীরচন্দ্র নিজে শম্ভু মুখুজ্যেকে থেকে যেতে বারংবার অনুরোধ করেছিলেন। তিনি সেই অনুরোধও বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মহারাজা মানুষটি ভালো, তবে তাঁর চারপাশের লোকজনেরা হল পাজির পা-ঝাড়া। তারা নিজেদের স্বার্থের বাইরে আর কিছু বোঝে না। শম্ভু মুখুজ্যে আগরতলা ছেড়ে চলে এলেও মহারাজার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। কলকাতায় তিনি মহারাজার অ্যাডভাইজারের কাজ করছেন। এখানকার প্রভাবশালী লোকজনদের সঙ্গে শম্ভু মুখুজ্যের খুব দহরম মহরম। ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ আছে। বড়লাট সাহেব,

ছোটলাট সাহেবের বাড়ীতেও তাঁর যাতায়াত রয়েছে।

কলকাতায় ত্রিপুরা রাজ্যের বৈষয়িক স্বার্থ দেখার দায়িত্ব শম্ভু মুখুজ্যের ওপর ন্যস্ত। মহারাজার অনুরোধে প্রয়োজন উপস্থিত হলে তিনি তা করেন। এরজন্য তিনি কোন বেতন বা অর্থ নেন না। এটি ত্রিপুরার মহারাজা এবং জনগণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।

কুশলাদি বিনিময়ের পরে মহিম বললেন, ভীষণ বিপদে পড়ে এসেছি মুখুজ্যে সাহেব। মহারাজা আপনার কাছে পাঠালেন পরামর্শ করতে। সব খুলে বলতে সময় লাগবে। মহিমকে থামিয়ে দিয়ে শম্ভু মুখুজ্যে বললেন, খুলে বলার দরকার নেই। আমি সব জানি। এখানকার অমৃতবাজার ইংলিশ পত্রিকায় সব বেরিয়েছে। অত চিন্তা করার কিছু নেই। এখন স্নানটান করো। তারপর খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে নাও। বিকেলবেলা কথা হবে ধীরে-সুস্থে।

শম্ভু মুখুজ্যে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, এবার আমাকে বাইরে বের হতে অনুমতি দিতে হবে। আর তো আমি ঘরে আটকে থাকতে পারব না। তুমি নিজেই তো শুনলে ত্রিপুরার অবস্থা। আমাকে এখন ছোটাছুটি করতে হবে। আমি কি দু'একদিনের মধ্যে বের হতে পারব, ডাক্তার ?

ন্যাকামো রাখো, ডাক্তারবাবু কপট গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার হিম লাগার বাতিক আছে, তাই। নইলে তুমি ঘুরে মর, আমার তাতে কি যায় আসে। এবার উঠি।

ডাক্তারবাবু চেয়ার থেকে উঠে স্টেথোস্কোপটি ভাঁজ করে গুটিয়ে নিচ্ছেন, শম্ভু মুখুজ্যে হঠাৎ বললেন, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমাদের দু'জনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি। এই হল মহিম চন্দ্র দেববর্মণ। ত্রিপুরার মহারাজার দেহরক্ষী, পার্শ্বচর, পরামর্শদাতা এবং সব ভালো-মন্দের সাক্ষী। আর এ হল আমার ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। কলকাতার এক নম্বর ডাক্তার তবে ধৈর্য কম, অল্পেতেই চটে যায়।

মহিম ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নামডাক আগেই শুনেছেন। সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। পরমহংসদেব রামকৃষ্ণের চিকিৎসা মহেন্দ্রলাল করেছিলেন। সেই সুবাদে রামকৃষ্ণ ভক্ত একজনের মুখে ডাঃ সরকারের কথা তাঁর জানা হয়েছে।

কিছুটা এগিয়ে এসে ডাঃ সরকারের পথ আগলে মহিম বললেন, ডাক্তারবাবু, আপনি কি খানিকটা বসবেন, আপনার সঙ্গেও আমার জরুরি পরামর্শ আছে।

শম্ভু মুখুজ্যে এবং মহেন্দ্রলাল দু'জনেই বিস্মিত হয়ে তাকালেন। ডাঃ সরকার ভ্রূ কোঁচকালেন।

মহারাজা বীরচন্দ্রের স্বাস্থ্যটি বেশ কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। অল্পেতেই তিনি হাঁপিয়ে উঠছেন — যেন দম পাচ্ছেন না। ঘন ঘন অল্প অল্প পেচ্ছাব হচ্ছে। পা দু'টো ফুলে গিয়েছে।

চোখের নিচের পাতাও ফোলা । কি করা বলুন তো ? মহিম উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন ।

মহেন্দ্রলাল বললেন, মহারাজাকে একবার কলকাতায় আসতে বলুন । ভাল করে দেখে-টেখে একটা চিকিৎসা করা যাবে ।

মহারাজ এখন কিছুতেই আগরতলা ছেড়ে আসতে পারবেন না । ব্রিটিশেরা রাজ্য কেড়ে নিচ্ছে । তাছাড়া প্রাসাদের ভেতরও ষড়যন্ত্র । চিকিৎসা বা অন্য কোন কারণে কলকাতা এলে ফিরে গিয়ে আর সিংহাসনটি পাবেন না । আপনি বরং কিছু ওষুধপত্র আর পরামর্শ দিন । আমি ফিরে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করে দিই।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভেতরে ভেতরে রেগে কাঁই হয়ে গেলেন । বাইরে সেসব প্রকাশ না করে বললেন, এভাবে চিকিৎসা শুরু করা যায় না । তবে আপনি যা বললেন শুনে মনে হচ্ছে মহারাজা বীরচন্দ্রের ব্রাইটস্ অসুখ । ব্রাইটস্ ডিজিজ মানে কিডনি নষ্ট হওয়া । সবেমাত্র বিলেতের একজন ডাক্তার — তাঁর নাম ব্রাইট, অসুখটা আবিষ্কার করেছেন এবং তার চিকিৎসা বের করেছেন । কলকাতায় এখনও এর চিকিৎসা আসেনি । কয়েকদিন আগে আমি ব্রাইটস্ ডিজিজ সম্পর্কে একটি আর্টিকেল জার্নালে পড়েছি । যাই হোক, মহারাজ কলকাতায় এলে দেখেটেখে কি করা যায় আমি ভেবে দেখবো'খন।

আমি আগরতলায় গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখি মহারাজকে কলকাতায় নিয়ে আসতে পারি কিনা । তবে যতদিন তিনি না আসতে পারছেন ততদিনের জন্য একটা কিছু ঔষধ যদি লিখে দেন তাহলে খুব ভালো হয় ।

মহেন্দ্রলালের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার উপক্রম হল, তিনি অসীম চেষ্টায় তা সামলে নিলেন। তারপর প্যাড বের করে তাতে একটা প্রেসক্রিপশান খসখস করে লিখে মহিমের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এখানে সাত দিনের ঔষধ আছে ।

মহিম হা হা করে উঠে বললেন, আমি তো আগরতলা যাব সাত আটদিন বাদে, এখানকার কাজ সেরে ।

তাতে কি আছে । যাবার আগে আমাকে জানিয়ে যাবেন ।

ওষুধগুলো কার জন্য ? কে খাবে ?

কেন, আপনি খাবেন । যার কাছ থেকে রোগের লক্ষণগুলো শুনলাম, এগুলো আপাতত তার জন্য । আসল রুগীর জন্য পরে ওষুধ দেব — দেখেটেখে। মহেন্দ্রলাল অবলীলায় বললেন কথাগুলো । একটুও হাসলেন না ।

এদিকে শম্ভু মুখুজ্যের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল । মহিম ফ্যালফ্যাল করে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের গটগট করে চলে যাওয়ার দিকে শুধু তাকিয়ে রইলেন ।

ঘুম ভাঙতে মহিমের বেশ দেরী হয়ে গেল । বেলা পড়ে এসেছে প্রায় । আগরতলা

থেকে কলকাতায় আসা বড় হ্যাঙ্গামা। ঘোড়ার গাড়ী, ট্রেন, স্টিমার তারপর আবার ট্রেন, স্টিমার তারপর আবার ট্রেন — কিছুই বাদ নেই। যাত্রাপথের ধকল মহিমকে কাবু করে ফেলেছিল। স্নানটান করে ভাল করে খেয়েদেয়ে এক লম্বা ঘুমের শেষে এখন শরীরটা বেশ ফুরফুরে লাগছে।

শম্ভু মুখুজ্যে একটা ফাইলে মুখ ডুবিয়ে কি যেন খুঁজছেন। মহিম আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে বললেন, মুখুজ্যে সাহেব, খুব ভালো ঘুম হল। এত ভাল ঘুম অনেকদিন হয়নি। দুপুরে কেন, রাত্তিরেও না।

ফাইল থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার একটা নিউজ ক্লীপিং বের করে শম্ভু মুখুজ্যে বললেন, পেয়েছি। এটাই খুঁজছিলাম। কলকাতায় বাংলা-ইংরেজী যত পত্রপত্রিকা আছে— সেগুলোতে ত্রিপুরা সম্পর্কিত যত খবরাখবর ছাপা হয় শম্ভু মুখুজ্যে সযত্নে কেটে সেগুলোকে পরপর সাজিয়ে রাখেন। কিছুদিন আগে জুলাই মাসের একদিন ছাপা হয়েছে—

'অবস্থার এতই অবনতি হয়েছে যে স্যার রিভার টমসন ত্রিপুরার মহারাজকে তাঁর অধীনস্থ একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেছেন। পলিটিকেল এজেন্ট মিঃ গ্রীয়ার একদিন মহারাজকে রাজপ্রাসাদের ভেতর ফুলবাগিচায় আলোচনার জন্য আলাদা করে ডেকে নেন। মহারাজকে তাঁর পরামর্শদাতাদের কাছ থেকেও তখন বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। মিঃ গ্রীয়ার এবং তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট বাবু উমাকান্ত দাসের মাঝখানে মহারাজকে জবরদস্তি করে বসানো হয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে যেন তিনি চাপের মুখে ত্রিপুরা রাজ্যটিকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। আরও আশ্চর্য সংবাদ, চাপের কাছে নতি স্বীকার করে মহারাজা পাঁচ বছরের জন্য সিংহাসন থেকে পদত্যাগ করার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন।'

অমৃতবাজারে প্রকাশিত সংবাদটি প্রথম দেখতে পেয়েই শম্ভু মুখুজ্যে খুবই বিচলিতবোধ করেন। আগরতলা থেকে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ আসার আগেই ব্রিটিশ সরকারের এই হীন প্রচেষ্টাকে আটকানোর জন্য যেখানে যা করার বা যার যার সঙ্গে যোগাযোগ করলে কাজের কাজ হবে তা শুরু করে দেন। শম্ভু মুখুজ্যে জানতেন, ত্রিপুরা থেকে কেউ ছুটে আসবেই। আজ মহিম এসেছে। তিনি তাই অবাক হননি।

ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে শম্ভু মুখুজ্যে বললেন, মহারাজাকে এভাবে গ্রীয়ার আলাদা করে নিয়ে গেল। এ তো অপহরণ! তোমরা তখন কি করছিলে?

আমরা কি করবো? মহারাজা আমাদের কাউকে সঙ্গে যেতে দেননি। মহারাজার ভীষণ অভিমান হয়েছিল। মহিম শান্ত গলায় বললেন।

ধমকের সুরে বললেন শম্ভু মুখুজ্যে, বলিহারি তোমাদের। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে কোথাও অভিমান বা ভাবাবেগের স্থান আছে নাকি? আসলে ত্রিপুরা রাজ্যের আজকের এই হাল কেন জানো তো? মহারাজার চারপাশের লোকজনদের কোন কাজের কাজ নেই। এঁরা কবিতা

লেখে, ছবি আঁকে, নৃত্য গীতে ফূর্তি করে দিন কাটায়। মহারাজার মধ্যেও এগুলো সংক্রামিত হয়েছে। যিনি কবিতার ছন্দমিল হন্যে হয়ে খোঁজেন, তাঁর রাজ্য প্রশাসনে যে ঘন ঘন ছন্দপতন হবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দু'বোন এক সঙ্গে ঘর করে না। ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ ফার্সীতে কবিতা লিখতেন। তাঁর হালটা কি হয়েছে দেখেছো তো। এখন সুদূর বার্মা মুলুকে সাড়ে তিন হাত জমিনের নিচে শুয়ে আছেন। বেচারীর জন্য নিজের দেশের এক রত্তি মাটিও জোটেনি। মহিম, এখনও সময় আছে, মহারাজাকে বলো, কবিতা-টবিতা না লিখতে, বরং রাজ্য শাসনে মন দিতে।

অসহিষ্ণু গলায় মহিম বললেন, রাজ্যই নেই। রাজ্য শাসনের প্রশ্ন আসে কোত্থেকে?

তুমি শুরুতেই এত হতাশ হয়ে পড়ছো কেন? শম্ভু মুখুজ্যে মহিমকে আশ্বস্ত করে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু সুখবর আছে। তোমাদের কপালটা ভাল বলতে হবে। ছোটলাট সাহেব টমসন, যে কিনা নাটের গোড়া, বদলি হয়ে বিলেত ফিরে যাচ্ছে। স্যার স্টুয়ার্ট বেইলী হবেন নূতন ছোটলাট। বেইলী আমার পুরোনো বন্ধু। অবশ্য ছোটলাট সাহেবের কুর্সীতে বসলে আগের মত আমার বন্ধু থাকবেন কি না এখনই বলতে পারি না। ইংরেজ ব্যাটারা ঘন ঘন পাখা বদলায়। বেইলী মনে হয় সেরকম হবে না। তবে এটা ঠিক টমসন না থাকলে তার চ্যালা সাঙ্গপাঙ্গ, লায়েল গ্রীয়ার আর উমাকান্তদের হামবড়াই আর থাকবে না। বেইলীর লোকজনেরা এবার ক্ষমতাবান হয়ে উঠবে। আমি ত্রিপুরার ব্যাপারটা এই ফাঁকে ঠিকঠাক করে নেব। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, মহিম।

মহিম সব শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুচকি হেসে বললেন, একটা কেন? ত্রিপুরার জন্য হাজারটা কাজ করব। আপনি শুধু হুকুম করুন।

শম্ভু মুখুজ্যে তাঁর ক্লীপিং-এর ফাইল থেকে খুঁজেপেতে আর একটা সংবাদের কাটিং বের করলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছেঃ আমরা জানতে পেরেছি, কতটা সত্য অবশ্য বলতে পারি না, মহারাজা বীরচন্দ্র পাঁচ বছরের জন্য তাঁর রাজ্যপাট ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবার সম্মতি জানিয়ে যে চিঠি লিখেছেন সে চিঠির ভাষা এতই অসৌজন্যমূলক এবং অশিষ্ট শব্দাবলীতে পরিপূর্ণ যে তাতে ব্রিটিশরাজ অপমানিত বোধ করেছেন। অবশ্য চিঠির হঠকারী শব্দ চয়নের জন্য মহারাজাকে দায়ী করা চলে না, কেননা তিনি নিজে ইংরেজী জানেন না। মহারাজা সম্ভবত তাঁর বক্তব্য সচিবকে জানিয়েছেন, সচিব ইংরেজীতে তা অনুবাদ করেছেন। সচিবের ইংরেজী জ্ঞানের স্বল্পতার ফলে এরকম একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যা হওয়া মোটেই উচিত হয় নি।

শম্ভু মুখুজ্যে গম্ভীর হয়ে বললেন, চিঠিটার একটা কপি আমি দেখেছি। এর ভাষা কদর্য এবং আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ। চিঠিটা কে লিখেছে?

মহিম আমতা আমতা করে বললেন, আজ্ঞে, রাধারমণ ঘোষ।

কোন রাধারমণ? ঐ যে তোমাদের দার্শনিক এবং কবি — সেই রাধারমণ ঘোষ?

মহিম সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন । শম্ভু মুখুজ্যে বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি তোমাকে বলিনি এসব দার্শনিক-টার্শনিক দিয়ে দেশ চালানো যায় না ? দার্শনিক, তার উপর আবার কবি, বোঝো ঠেলা. । একে মা মনসা তায় ধূনোর গন্ধ । যার যা কর্ম নয় তাকে সে কাজে জুড়ে দিলে এরকম হবেই ।

মহিম স্বগতোক্তির মত বললেন. রাধারমণ ঘোষ লোকটা কিন্তু ভালো । তিনি যে জ্ঞানতঃ মনিবের অনিষ্ট করে নিম্নগামী হবেন তাও কখনও বিশ্বাস করা যায় না ।

তোমার এখনও আক্কেল হল না মহিম, শম্ভু মুখুজ্যে ধমকে বললেন, আরে, রাজ্য চালানো হল কূটনীতি । এটা বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ বা তার ব্যাখ্যা করা নয় । আর ইংরেজী হল বিদেশী ভাষা, আমাদের মাতৃভাষা নয় । তুমি একটা চিঠি লিখছো তাঁকে, যাঁর মাতৃভাষা ইংলিশ। তিনি তোমার মনিবেরও মনিব । সর্বেসর্বা । তাঁকে চিঠি লেখার সময় তোমাকে অনেক ভেবে চিন্তে সৌজন্য সহকারে মোলায়েম মধুর শব্দ দিয়ে চিঠি লিখতে হবে । ইংরেজী ভাষা তোমার বাংলার মত জলভাত না । এখানে অনেক মুরজা আছে । রাধারমণ খোল করতাল কীর্তন নিয়ে থাকে । তার সেগুলো জানারও কথা না । শোনো মহিম, আর একটা চিঠি লিখে আগের চিঠিটা প্রত্যাহার করে নাও ।

মহিম পরিস্থিতি হাল্কা করার জন্য হাসতে হাসতে বললেন, এই চিঠিটাও যে আবার ইংরেজদের অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায় ?

শম্ভু মুখুজ্যে বললেন, তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না । আমি সব ঠিক করে রেখেছি। আমার এক সুহৃদ বন্ধু আছেন দুর্গামোহন দাস । আমার অনুরোধে তিনি আগরতলা যাবেন । সেখানে মহারাজার সঙ্গে কথা-টথা বলে একটা জুতসই মুসাবিদা তিনি করে দেবেন । তাঁকে আগরতলা পাঠাচ্ছি অন্য একটি কারণে। তিনি ব্রাহ্ম, আবার তোমাদের উমাকান্তও ব্রাহ্ম । উমাকান্তও দাস আবার দুর্গাও দাস। দাসে দাস ক্ষয় । উমাকান্তকে প্রথমে বাগে আনতে হবে। প্রয়োজনে উমাকান্তকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে নিতে হবে । এগুলো দুর্গামোহন মহারাজাকে আমার হয়ে বুঝিয়ে বলবেন । তুমি বরং যাবার আগে দুর্গামোহনের সঙ্গে একবার দেখা করে যাও ।

দুর্গামোহন দাস হলেন মহিম ঠাকুরের বাবা আল হাজারী ভারতচন্দ্র ঠাকুরের বাল্যবন্ধু। সেই সুবাদে তিনি মহিমকে নিজের পুত্রের মত স্নেহ করেন । দুর্গামোহনের ধারণা, বিতর্কিত চিঠিটা মহিমের লেখা । মহিম ছোটবেলায় কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন । কলকাতার প্রভাবশালী লোকদের কাছে মহিমের জন্য অবারিত দ্বার । অনেক ইংরেজদের সঙ্গেও মহিমের বেশ সখ্যতা রয়েছে ।

সেই মহিম এরকম একটা অখাদ্য চিঠি লিখেছেন ভেবে দুর্গামোহন আগেই রেগে অগ্নিশর্মা হয়েছিলেন।

দুর্গামোহনের সঙ্গে দেখা করতে যেতেই মহিমকে দেখে তিনি হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, গাধার মত চিঠিটা ড্রাফ্‌ট করেছে কে ?

আজ্ঞে, আমি করিনি, মহিম নির্বিকার কণ্ঠে বললেন । অগ্নিতে আচমকা জল ঢেলে দেয়ার ফলে নির্বাপিত হতে হতে দুর্গামোহন বললেন, তবে কে লিখেছে ?

রাধারমণ ঘোষের নাম বলাটা এখানে অর্থহীন । দুর্গামোহন সম্ভবত রাধারমণকে চেনেন না । নাম জানলে দুর্গামোহন একরাশ গালিগালাজ বর্ষণ করবেন রাধারমণকে । নিরীহ রাধারমণ ঘোষের জন্য মহিমের মায়া হল । লোকটি সৎ এবং মহারাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। শুধু ইংরেজী ভাষার মার-প্যাঁচে রাধারমণের মত বৈষ্ণব সাত্ত্বিক মানুষটি খলনায়ক বা ভিলেন হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাছাড়া এটা একটি সত্যি ঘটনা যে রাধারমণ নিজের হাতে লিখলেও চিঠিটার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য মহারাজার নিজস্ব । বীরচন্দ্র ইংরেজী গড়গড় করে বলতে পারেন না বটে, তবে সবই বুঝতে পারেন । শুরু থেকেই গ্রীয়ার এবং উমাকান্তের 'সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী' ব্যবহারে মহারাজা চটেছিলেন। সেই রাগই ঝরে পড়েছে চিঠির ছত্রে ছত্রে। রাধারমণ নিমিত্ত মাত্র । মহিম ভালো করেই জানেন, রাধারমণ বিনয়ী এবং সজ্জন । মহারাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৌজন্যমূলক চিঠি লিখলে রাধারমণ ঘোষের মুণ্ডুটা কবে মাটিতে গড়াত । অমৃতবাজার পত্রিকা মহারাজা বীরচন্দ্রের হয়ে সাফাই গেয়ে যা'ই লিখুক না কেন, চিঠিটা মহারাজারই তো ! এর দায় তিনি এড়াতে পারেন না ।

দুর্গামোহন দাস মহিমকে চুপ থাকতে দেখে অধৈর্য হয়ে বললেন, শোনো মহিম। ছাগল দিয়ে হাল চাষ করতে পারলে আর গরুর দরকার হত না । ইংরেজী ভাষা হল ইংরেজী ভাষা, এ ছেলেখেলা নয় । ইংরেজীতে লিখতে গেলে এলেম থাকা চাই, বুঝলে ! আমি যাচ্ছি আগরতলায়। যে লিখেছে চিঠিটা তার নামটি বলো । সাতদিন তাকে ইংরেজী পড়াবো, কি করে ইংরেজীতে চিঠি লিখতে হয় শেখাবো । সবই বলা হবে, প্রথমে মালুম হবে না তবে টেরটি পাবে পরে । থানায় দারোগাবাবুরা কি করে চোর ডাকাতকে পেটায় জানো তো ? কম্বলে জড়িয়ে ডাণ্ডা পেটাই করে। দাগ থাকে না, কিন্তু ব্যথা থাকে । অমাবস্যা পূর্ণিমায় যাদু টের পায় । সেই ইংরেজী আমার জানা আছে । আগরতলায় কাকে শেখাতে হবে বলো।

যদি সত্যি এ ধাঁচের বাইরে মোলায়েম অথচ ভেতরে শক্ত কোন ইংরেজী কায়দা বলে কিছু থাকে তবে তা শেখা উচিত মহারাজা বীরচন্দ্রের । অবশ্য সে কথা মুখ ফুটে বলা যাবে না। মিছিমিছি রাধারমণ ঘোষকে ফাঁসিয়ে লাভ নেই । মহিম নিরাসক্তভাবে বললেন, কাকাবাবু, চিঠিটা আমি লিখিনি । কে লিখেছে, বিশ্বাস করুন, আমি জানি না।

পাঁচ

অনেকদিন বাদে মহারাজা বীরচন্দ্র এসেছেন কলকাতায় । ইতিমধ্যে আগরতলার হাওড়া নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে । বীরচন্দ্র ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিঠিটি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন । ত্রিপুরায় সুশাসন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্রিটিশের ইচ্ছানুসারে অ্যাসিস্টেন্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট বাবু উমাকান্ত দাসকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা হয়েছে । ব্রিটিশরা আগে বাইরে থেকে

খবরদারি করত, এখন উমাকান্ত দাসের মাধ্যমে ভেতর থেকে কলকাঠি নাড়াতে পারবে। ফলশ্রুতিতে পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যভার ব্রিটিশদের নিজের হাতে নেবার পরিকল্পনা বাতিল হল। এসব সামলাতে এবং ঘর গুছোতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। এখন প্রশাসনে স্থিরতা এসেছে তবে মহারাজের স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হয়েছে। এবারকার কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য হল মূলত স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং বিশ্রাম।

যেহেতু কলকাতা হল ভারতবর্ষের রাজধানী, এখানেই লাট সাহেবের বাস, তাই দেশীয় রাজাদের সবার এখানে নিজস্ব বাড়ী রয়েছে। রাজ্যের স্বার্থে রাজাদের মাঝেমাঝেই কলকাতায় আসতে হয়, আসতে হয় অন্যান্য কারণেও। কোন কোন রাজা কলকাতায় এলে সাড়া পড়ে যায়। গুড়ের চারপাশে যেমন ডেঁয়ো পিপড়েরা এসে জড়ো হয়, তেমনি খবর পেলেই রাজার চারপাশে একদল টাউট এসে জুটে যায়। বেশ্যাবাড়ী বা বাঈজী নাচের আসরে মদ্যের রঙিন ফোয়ারা বইতে থাকে। রাজ্য উপলক্ষ মাত্র, চেটেপুটে খায় ডেঁয়ো পিপড়েরা। অবশ্য মহারাজা বীরচন্দ্র দেশীয় রাজাদের মধ্যে পুরো ব্যতিক্রম। তাঁর কোন পানাভ্যাসের দোষ নেই, তিনি অন্যান্য সব 'ম'কারের দোষবর্জিত। মহারাজা বীরচন্দ্রের একমাত্র কবি এবং কবিতা সম্পর্কে দুর্বলতা রয়েছে। কলকাতায় এলে যা আরও বেড়ে যায়। আগে যখন কলকাতায় এসেছেন সময় পেলে হাতিবাগানে গিয়ে স্টারে থিয়েটার দেখেছেন। নাটক দেখে, বই পড়ে আর গান শুনে বীরচন্দ্রের দিন কেটে যায়। বীরচন্দ্র কলকাতায় এসেছেন শুনলে এক ধরনের ভিন্নরুচির লোক ১নং লিটল রাসেল স্ট্রিটের ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে ভিড় জমান।

আজ এখনও সবাই এসে পৌঁছননি। তবে জোড়াসাঁকোর তরুণ কবি রবিবাবু এসেছেন। তিনি একাই একশ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রাধারমণ ঘোষ, মহিম ঠাকুর এবং শম্ভু মুখুজ্যে।

কথায় কথায় আসর জমে উঠেছে। মহারাজা বীরচন্দ্র মধ্যমণি হয়ে আরামকেদারায় শুয়ে শুয়ে আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। বীরচন্দ্রকে ফ্যাকাশে লাগছে। সারা শরীরে অসুস্থতার ছাপ সুস্পষ্ট। চোখের নিচের পাতা এত ফুলেছে যে চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গেছে প্রায়। পাগুলোও ফুলে টইটম্বুর, যদিও দেখা যাচ্ছে না। মহারাজার মুখে ক্লান্তির রেখা, তবু তিনি হেসে বললেন, কি রবিবাবু! নতুন কি লিখলেন, সেখান থেকে কিছু আমাদের শোনান। রবিবাবু সলজ্জ হাসলেন। সৌম্য রবিবাবুর হাসিটুকুর স্নিগ্ধতা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি যেমন চুপ ছিলেন তেমনি চুপ করেই রইলেন। বীরচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে বললেন, আগরতলায় তো আপনার সব বই বা কবিতা গিয়ে পৌঁছয় না। যা-ও পৌঁছয়, সেগুলো পুরোনো এবং বাসি। তাজা লেখা থেকে দু'একটা পড়ে শোনান আজকে। এবারও মৃদু হাসলেন রবিবাবু। বীরচন্দ্র বললেন, কয়েকদিন আগে আপনার 'সোনার তরী' কবিতার বইটি আমার হস্তগত হয়েছে। দারুণ কাব্যগ্রন্থ। একটা কবিতার চেয়ে অন্যটা আরও দারুণ। বারবার পড়ে 'সোনার তরী'র অনেক কবিতা আমার পুরো মুখস্থ হয়ে গেছে। আপনি যদি এক্ষুণি কোন লেখা না শোনাতে চান, তবে আমি আপনাকে 'সোনার তরী' থেকে আপনারই কবিতা পাঠ করে শোনাতে

পারি। মহিম লক্ষ্য করলেন মহারাজার চোখেমুখে অসুস্থতার লক্ষণ স্পষ্ট হলেও মনটা তাঁর আজ খুব খুশি খুশি । মহারাজা বীরচন্দ্র চোখ বন্ধ করে কিছুটা উদাস হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ । তারপর চক্ষু মুদিত অবস্থায়ই ধ্যানমগ্ন ঋষির মত ভরাট গলায় মন থেকে গড়গড় করে দরদসহ আবৃত্তি শুরু করলেন—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা ।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা ।
রাশি রাশি ভারা ভারা, ধান-কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধার খরপরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ।।

* *

যত চাও তত লও তরণী-পরে ।
আর আছে ? —আর নাই দিয়েছি ভরে ।
এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে ।।

আবৃত্তি অসমাপ্ত রেখে বীরচন্দ্র হঠাৎ থামলেন । চোখ খুলে রবিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থটা কি বলুন তো ? 'সকলই দিলাম তুলে' তারপর আবার বলা হচ্ছে 'এখন আমারে লহো করুণা করে' । আমার মনের মধ্যে একটা অর্থ ধরা পড়ছে বটে তবে খোদ কবির মুখে শুনে নেয়া যাক কবি কি বলতে চাইছেন ।

রবিবাবু এবার সত্যি ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন । তিনি কি বলবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। মহারাজা চমৎকার পাঠ করছিলেন কবিতাটি, ছন্দ মিলিয়ে, যেখানে যতটা আবেগ তা দিয়ে এবং স্বর প্রক্ষেপণের ত্রুটি না রেখে । রবিবাবুকে চুপ থাকতে দেখে রাধারমণ ঘোষ আমতা আমতা করে বললেন, মহারাজ. যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমি কবির হয়ে একটা ব্যাখ্যা আপনার সামনে পেশ করতে চাই । জানি না রবিবাবু আমার মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন কি না, তবে আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিমত চেষ্টা করতে পারি ।

মহারাজা বীরচন্দ্র হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না । তবে নীরবে এমন একটি ভাব করলেন, যার অর্থ হল রাধারমণ বলতে পারে তাতে তাঁর আপত্তি নেই ।

রাধারমণ ঘোষ কেশে বললেন, আমার তো মনে হয় রবিবাবুর 'সোনার তরী' কবিতাটির মধ্যে আমাদের বৈষ্ণব তত্ত্বের দ্বৈতবাদের কথা বলা হয়েছে । একদিকে হল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি, আর অন্যদিকে হল বৃহৎ বিশ্ব । এই দু'য়ের সমন্বয়ের কথাই অতীন্দ্রিয় ভাবের মধ্য দিয়ে কবিতায় কবি সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন ।

রাধারমণ ঘোষ তাঁর মনের কথা বলার পর আসরে উপস্থিত অন্যান্য সবার দিকে তাকালেন।

সবাই নিশ্চুপ । হঠাৎ অট্টালিকার বিশাল প্রকোষ্ঠ থেকে একটি টিকটিকি ডেকে উঠল—টিক্ টিক্ টিক্ ।

চেয়ারের হাতলে আঙুলে টোকা দিতে দিতে রাধারমণ ঘোষ বললেন, সত্যের টিকটিকি । টিক্ টিক্ টিক্ । আমি যা বলেছি—ঠিকই বলেছি। দেখলেন তো ? মহারাজাসহ সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন ! বীরচন্দ্র খানিক বিরতির পর আস্তে আস্তে বললেন, আমার তো মনে হয় এখন আমারে লহ করুণা করে এই লাইনটিতে জীবনদেবতার কথা বলা হয়েছে । জীবনদেবতা এক অর্থে ঈশ্বর আবার এক অর্থে ঈশ্বর ননও । বীরচন্দ্র এবার রবিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ঠিক বললাম ?

রবিবাবু প্রত্যুত্তরে কিছু বলার আগেই সম্ভবত আগের টিকটিকিই ডেকে উঠল—টিক্ টিক্ টিক্। বীরচন্দ্রের হাসি আর বাঁধ মানে না । অতিকষ্টে হাসি চেপে তিনি বললেন, কি হে রাধারমণ, কি বুঝলে ? তুমিও ঠিক, আমিও ঠিক । তাই না ? এবার শোনা যাক্, খোদ কবি কি বলেন ?

রবিবাবু খুবই বিনীতভাবে বললেন, কবিতা হল একখণ্ড স্ফটিক । এর কৌণিক দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে পাঠকের মনোলোকে যেখানে যেভাবে আলো ফেলবে—তাই তার অর্থ । আমি আর নিজে কি বলব ?

বাহবা দিয়ে বীরচন্দ্র বললেন, খুব খাসা বলেছেন আপনি রবিবাবু । কবিতা হল স্ফটিকখণ্ড। আমি কবিতার অনেক মানে শুনেছি, কিন্তু এরকম অর্থবহ সংজ্ঞা আমি আগে শুনিনি কখনো। সাবাস ।

নীচে লিটল রাসেল স্ট্রিটের বাড়ীর গেটে হঠাৎ শোরগোল শোনা গেল কিসের যেন । কবিতা বিষয়ক সারগর্ভ আলোচনায় ছেদ পড়ল । মহিম ঠাকুর দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখলেন গেটে স্যুটেডব্যুটেড ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে দারোয়ানের কথা কাটাকাটি চলছে । ডাঃ সরকার ভেতরে ঢুকতে চান, দারোয়ান আগন্তুককে ঢুকতে দেবে না ।

ফের ফিটনের গাড়ীতে উঠবার আগে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার শাসালেন, ঠিক আছে । ভালোর জন্য নিজে থেকে এসেছিলাম দেখতে, তোরা তো দিলি না । এখন তোদের রাজা নিজে যখন আমার চেম্বারে গিয়ে দু'ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখাবে তখন আক্কেল হবে তোদের।

মহিম বুঝলেন, নারদ ক্ষেপেছে । তাঁকে আটকানো দরকার । নিচে ছুটে এসে ডাঃ সরকারের হাত থেকে ডাক্তারি বাক্সটি নিজের হাতে নিয়ে বললেন, আমি দুঃখিত, ডাঃ সরকার । দারোয়ানগুলি হল গাড়োল । এরা আপনাকে চিনতে পারেনি, তাছাড়া আপনিও নিজের পরিচয় দেননি । চলুন ওপরে । মহারাজা আপনাকে দেখলে খুশি হবেন ।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কোন কথা না বলে রাগে গজগজ করতে করতে দোতলায়

মহারাজার কবিতা পাঠের আসরে এসে মূর্তিমান বেরসিকের মত উপস্থিত হলেন।

কোন ভূমিকা না করে সরাসরি মহারাজার সামনে গিয়ে বললেন, হাঁ করুন তো, হাঁ। এবার জিহ্বাটা দেখান। বীরচন্দ্র হতচকিত হয়ে বাধ্য শিশুর মত জিহ্বা বের করে দেখালেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহারাজার চোখের পাতা টেনে উল্টে ধরে চোখের মণিটুকু দেখলেন। তারপর স্টেথো খুলে বুকে-পিঠে লাগিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। একসময় গলাখাঁকারি দিয়ে পেছন ফিরে সবার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পেরে একে একে সবাই ঘরের বাইরে বারান্দায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে ডাঃ সরকার আবার কাশলেন। যাঁরা বাইরে ছিলেন, তারা আবার ভেতরে এলেন। মহারাজা প্রায় অর্দ্ধনগ্ন। মহিম দৌড়ে ছুটে এসে মহারাজার পরনের ফিনফিনে ধুতিখানা পরিপাটি করে আবার পরিয়ে দিলেন।

বীরচন্দ্র আরাম করে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে এই প্রথম কথা বললেন, তুমিই কি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ? মহিম তোমার কথা আমাকে বলেছিল। তুমি নাকি খুব রগচটা মানুষ। চট করে রেগে যাও। যাক গে সেসব কথা। এবার বলো, কেমন দেখলে। কিরকম বুঝছো ?

ডাঃ সরকার খুব একটা সৌজন্যের ধারেকাছে না গিয়ে রাগতস্বরে বললেন, শুনুন মহারাজ, আপনাকে একটা কথা বলি। আমি আপনার খাস তালুকের প্রজা নই, তাছাড়া আমি আপনার বেতনভুক কর্মচারীও নই।

মহারাজা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, এসব কথা বলার মানেটা কি ?

এসব কথা এজন্য বলছি যে, আপনাকে দেখে ডাক্তার হিসেবে আমার যা মনে হয়েছে তা স্পষ্টাস্পষ্টি বলব। রেখেঢেকে আপনাকে খুশি করার জন্য কিছু বলতে পারবো না। ডাক্তারি জুরিসপ্রুডেন্সে বলেছে, রোগীকে সত্য বলতে হবে। রোগীর তা ভালো লাগুক আর না লাগুক। বীরচন্দ্র অধৈর্য হয়ে বললেন, তোমাকে মোসাহেবি করতে কেউ বলেনি। যা সত্য তাই বলো।

গম্ভীর হয়ে ডাঃ সরকার বললেন, আপনি শক্ত অসুখ বাধিয়েছেন। আপনার কিডনি দুটোই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। আর তাছাড়া আপনি দেরী করে ফেলেছেন, আরও আগেই আপনার আসা উচিত ছিল।

ঠিক আছে। যা দেরী হবার তো হয়েইছে। এখন বল কি করতে হবে। বীরচন্দ্র কম্পিত গলায় বললেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছে আপনার চিকিৎসা করার কিছু নেই। কলকাতায় এই ব্রাইট্স ডিজিজের চিকিৎসা এখনও হয় না। আমি ইচ্ছে করলে মিথ্যে মিথ্যে একগাদা ওষুধ আপনার জন্য প্রেসক্রিপশন করতে পারি। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরং তাতে আপনার কষ্ট আরও বেড়ে যাবে।

মহারাজা বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, তাহলে আমার কী করণীয় এখন ?

আমার পরামর্শ হল, আপনি টেনশন ফ্রি জীবনযাপন করুন । ত্রিপুরা রাজ্যের চিন্তাভাবনা অন্যের কাছে দিয়ে দিন । রাজকীয় ঝুটঝামেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনুন । আপনার এখন বয়স কত হল ?

ষাট ।

ষাট তো অনেক বয়স । এত দীর্ঘকাল কম লোকই আজকের দিনে বাঁচে । ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, আমি বলি কি, যদি কিছু শখ-আহ্লাদ বাকি থাকে তবে তা এখনই মিটিয়ে নিন ।

মহিম এতক্ষণ মহারাজা আর ডা: সরকারের মধ্যে বাক্যালাপ শুনছিলেন । ডা সরকারের কাঠ কাঠ কথাবার্তা মোটেই তাঁর মনঃপুত হচ্ছিল না । শম্ভু মুখুজ্যে যদিও ডাঃ সরকারের বন্ধু, তাঁরও ডাক্তারের চ্যাটাং চ্যাটাং কথাগুলো ভালো লাগছিল না । যত তাড়াতাড়ি ডাঃ সরকার বিদেয় হন, ততই ভালো, নইলে কথায় কথায় কোথায় যে শেষ পর্যন্ত জল গিয়ে গড়াবে কে জানে । উপস্থিত সবাই অস্বস্তিতে উসখুস্ করছিলেন । সবাইকে অবাক করে দিয়ে মহারাজা ডাঃ সরকারকে ইশারায় একটা কুর্সিতে বসতে বললেন । পায়ের উপর পা তুলে ডাঃ সরকার অনিচ্ছাসত্বেও বসলেন ।

বীরচন্দ্র বন্ধুসুলভ হাল্কা সুরে বললেন, তুমি আমাকে শখ আহ্লাদ মিটিয়ে নেবার কথা বলেছো । ষাট বছরের দীর্ঘ জীবনে কোন ইচ্ছা এখনও আমার অপূর্ণ আছে বলে মনে হয় না । তবে একটা সাধ আমার এখনও বাকি আছে, জানি না সেটা আদৌ পূরণ হবে কি না ।

মহারাজার মুখের দিকে সবাই তাকিয়ে আছে । কি সেই সাধ যা এখনও পূর্ণ হয়নি ?

বীরচন্দ্র সবাইকে বিমূঢ় করে দিয়ে বললেন, আমি একটা বিয়ে করতে চাই, এবার মেম সাহেব কনে হবে । মেমসাহেব বিয়ে করার সাধটুকু আমার এখনও পূরণ হয়নি ।

মহিম লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলেন । মেমসাহেব বিয়ে করাটা যে রসিকতা নয় তা বোঝাবার জন্য বীরচন্দ্র শান্ত গলায় বললেন, আমি জানি, তোমরা অবাক হচ্ছ । আমার অসংখ্য স্ত্রী থাকতে আবার আমি একটা মেমসাহেব বিয়ে করতে চাইছি কেন ? মেমসাহেব বিয়ে করতে চাইছি রাগে দুঃখে । ইংলিশ জানিনা বলে ব্রিটিশরা আমাকে হ্যাটা করে । আমার চিঠি আবার আমাকেই ফিরিয়ে নিতে হয়েছে । নিজের থুতু গিলতে হয়েছে আমাকে । এই অপমান আমি আর সহ্য করতে পারছি না ।

রাগের লক্ষণটুকু চেহারায় ফুটে উঠতেই বীরচন্দ্র তা চেপে রেখে বললেন, মেমসাহেব রাণী হলে কত সুবিধে জানো তো ? তখন আর পরের মুখে ঝাল খেতে হবে না । মেমসাহেব বউকে নিয়ে বল ডান্সে যাব, কোমরে হাত রেখে নাচব । খোদ বড় লাটসাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলব । ছোট বা হেজিপেজির সঙ্গে কথা বলতে হবে না । ইংরেজিটা আমাকে মেরে রেখেছে এতদিন । মেমসাহেব রাণী হলে আমার আর ইংরেজির সমস্যা থাকবে না ।

খই ভাজার মত আমি তখন ইংরেজি বলব অনর্গল ।

আলোচনাটা কিঞ্চিৎ লঘু করার জন্য ডাঃ সরকার বললেন, আপনার আইডিয়াটা মন্দ নয়। তবে কলকাতায় বিয়ে করার জন্য মেমসাহেব কনে পাবেন কোথায় ? অবশ্য খোঁজখবর করলে ডিভোর্সি মেমসাহেব পেয়ে যাবেন ।

হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বীরচন্দ্র ধমকে বললেন, তোমার আক্কেলের বলিহারি, ডাক্তার । তুমি কি জানো না, উচ্ছিষ্ট কখনও রাজাদের ভোগে লাগে না । আমার জন্য কোরা মেমসাহেব চাই ।

চিন্তান্বিত হয়ে ডাঃ সরকার বললেন, কোরা মেমসাহেব এদেশে পাবেন কোথায় আপনি ? তাহলে তো আপনাকে বিলেত যেতে হয় । সেখানে কমবয়সী মেমসাহেব পাবেন যার আগে বিয়ে হয়নি ।

হ্যাঁ, আমি বিলেত যেতে চাই । জোর দিয়ে বললেন বীরচন্দ্র । মেমসাহেব বিয়ের জন্য আমি যাব । বিলেত যাব আর একটা কারণে । সেখানে গিয়ে সস্ত্রীক আমি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা করব । দেখা করে সামনাসামনি ইংরেজিতে নালিশ করব মহারাণীর ভারতের ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের নামে । মহারাণীর নামে যেভাবে অপোগণ্ডেরা এদেশ শাসন করছে, এভাবে চললে আর বেশীদিন বাকি নেই যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারত থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে ।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের হাসি পেল মহারাজা বীরচন্দ্রের প্ল্যান প্রোগ্রাম শুনে । মহারাজা মানুষটা খুবই সরল এবং খোলামেলা । কোনরকম কপটতার চিহ্ন নেই কথাবার্তায় । যা মনে আছে, তাই স্পষ্ট করে বলে ফেলেছেন । কোন রাখঢাক গুড়গুড় নেই । ডাঃ সরকার খোলা মন নিয়ে বললেন, মহারাজ, আমিও চাই, আপনি বিলেত যান । বিলেত যাওয়ার আপনার দরকার আছে স্বাস্থ্যের কারণে । সেখানে গিয়ে আপনি ডাঃ ব্রাইটসের কাছে নেফ্রাইটিসের চিকিৎসাটা করে সুস্থ হয়ে আসুন ।

বললাম তো তোমাকে । ধৈর্যহীন হয়ে বীরচন্দ্র বললেন, বিলেত যাবো আমি তিনটি কারণে । এক, মেমসাহেব বিয়ে করব বলে । দুই, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে সাক্ষাতে নালিশ করব বলে । এবং তিন, কিডনির চিকিৎসাটা করাব সেখানে ।

এক আর দুইয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই । আপনি মেমসাহেব বিয়ে করুন আর না করুন অথবা ভিক্টোরিয়ার কাছে নালিশ করতে পারলেন কি পারলেন না, তাতে আমার কিছু যায় আসে না । আমি আগ্রহী আপনার চিকিৎসা বিষয়ে । ডাঃ ব্রাইটসের কাছে কিডনির চিকিৎসা করে আপনি সুস্থ হয়ে আরও দীর্ঘায়ু হোন, সেটাই আমি চাই ।

বীরচন্দ্র আশ্বাস দেবার জন্য হাত তুলে বললেন, দেখো ডাক্তার । তুমি কিছু ভেবো না । সব হবে । আমি আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবো, তোমাকে বলছি । কয়েকদিনের মধ্যে এই রবিবাবুকে নিয়ে কার্সিয়াঙে চেঞ্জে যাচ্ছি । ওখানে নিরিবিলিতে কাব্যসুধা পান করবো ।

শরীরটা চাঙ্গা আর মনটা চনমনে হলেই কার্সিয়াং থেকে ফিরব কলকাতায় ।কলকাতা থেকে সরাসরি চলে যাব বিলেত । বিলেত থেকে সুস্থ হয়ে সস্ত্রীক ফেরার পথে কলকাতায় এসে তোমাকে ডেকে পাঠাব। তুমি মিলিয়ে নিয়ো আমার কথা । আমি কথা দিলে কথা রাখি ।

ছয়

এবারের শীতটা মনে হয় অন্যান্যবারের চেয়ে বেশী । এখন মোটে অগ্রহায়ণ মাস । সামনে আরও শীত বাড়বে । শৈলশহর কার্সিয়াঙে শীতের বুড়ি হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। ঘরের ভেতর শাল মুড়ি দিয়ে জম্পেশ করে বসেও শীতকে কাবু করা যাচ্ছে না । ফায়ারপ্লেসে আগুনকে উস্কে দিতে হচ্ছে মাঝেমাঝে ।

অন্যান্য দিনের মত মহারাজা বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন । এদিকে টি-পটে দার্জিলিং চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে । বীরচন্দ্র এক সঙ্গে চা খাবেন বলে একা শুরু করেন নি । অবশ্য চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিছু যায় আসে না, আবার চা হবে । বারেবারেই চা হতে পারে । আড্ডায় মশগুল হয়ে গেলে ফাঁকে ফাঁকে কতবার যে চা আসে তার ইয়ত্তা নেই। হাল্কা সুগন্ধী ধূমায়িত চা খেলে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগে ।

রবীন্দ্রনাথ যখন এলেন তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে । ঘরে ঢুকে অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিলেন তিনি । 'ক্যাম্প সাইড'-এর বাড়ী থেকে, যেখানে রবিবাবু মহারাজার অতিথি হয়ে অবস্থান করছেন, এ বাড়ীটিতে আসতে বেশ কয়েকটা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তবে এসে পৌঁছুতে হয় । আসলে রবিবাবু অনেক আগেই আসতে পারতেন । তিনি জানেন তাঁর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন মহারাজা বীরচন্দ্র । সকালের চেয়ে বিকেলের আড্ডাটা বেশি জমে । এ আড্ডাটি শেষ হতে হতে কোন কোন দিন বেশ রাত হয়ে যায় । তবু আলোচনা যেন অসমাপ্ত থেকে যায়। কবিতা পাঠ, গান আর আধ্যাত্মিক আলোচনা, এসবের জন্যই তো সংসারের কোলাহল এড়িয়ে এই নিরিবিলি কার্সিয়াঙে আসা । এখানে এসব ছাড়া আর কিছু নেই ।

দেরীতে আসার জন্য রবিবাবু সসঙ্কোচে একটা কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করতেই বীরচন্দ্র লঘু স্বরে বললেন, আগে চা খেতে আজ্ঞা হোক । পরে সব শোনা যাবে । রবীন্দ্রনাথ চায়ে চুমুক দিতে দিতে তাঁর কাঁধের ঝোলার ভেতর থেকে একটা মোটা বই বের করলেন । বইটার মলাট এবং ভেতরের পৃষ্ঠাগুলো উল্টেপাল্টে দেখলেন । নূতন ছাপা বাঁধাইয়ের গন্ধ লেগে আছে এখনও । মাত্র কিছুদিন হল রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থাবলী' নামে বইটি প্রকাশিত হয়েছে । এটি নূতন বই নয়, আজ পর্যন্ত যত বই রবিবাবুর বের হয়েছে সেগুলোর মোটামুটি সংকলন এটি । এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২+২+৮+৪৭৬, মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ১০০০ । পুস্তকটির প্রকাশক ঃ শ্রী সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় । আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত । পুস্তকটিতে মোট কুড়িখানি কাব্য মুদ্রিত হয়েছে—কৈশোরক, ভানুসিংহ, বাল্মীকি প্রতিভা, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মায়ার খেলা,

মানসী, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, সোনার তরী; চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, চিত্রা, মালিনী নাটক, চৈতালী, গানের বহি এবং অনুবাদ প্রভৃতি । কাব্যগ্রন্থাবলীর একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাজারজাত করা হয়েছে । এর মূল্য পঁচিশ টাকা । উৎকৃষ্ট সংস্করণটি উৎকৃষ্ট কাগজ এবং মরক্কোয় বাঁধা। এতে রয়েছে রবীন্দ্রবাবুর আধুনিক একটি প্রতিমূর্তি, পদ্মাতীরস্থ কবির তরী প্রবাস এবং কবির জন্মনিবাসের চিত্রাবলী । আজকের ডাকে পার্সেলে কাব্যগ্রন্থাবলীর উৎকৃষ্ট সংস্করণটি এসে পৌঁছেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে । এ বইটির জন্য এতদিন তিনি অপেক্ষা করছিলেন । নিজের হাতে মহারাজা বীরচন্দ্রকে একসঙ্গে গ্রথিত গ্রন্থাবলীটি তিনি উপহার দেবার জন্য মনস্থ করে বসে আছেন অনেকদিন ধরে ।

রবীন্দ্রনাথ ফায়ারপ্লেসের অন্যদিক থেকে উঠে এসে অনেকটা নতজানু হয়ে বিনীতভাবে মহারাজার করতলে 'কাব্যগ্রন্থাবলী' বইটি তুলে দিলেন । বীরচন্দ্রের চোখ-মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । তিনি বইটি উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন । কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ বইটি রবিবাবুর হাতে আবার ফেরত দিয়ে বললেন, এ বই আমি নেব না । এ বইয়ে আপনি আপনার সই করে দেননি আমাকে ।

মরমে মরে গিয়ে রবিবাবু বইটির প্রচ্ছদটি সরিয়ে ভেতরের পাতায় সই করে তারিখ বসিয়ে মহারাজার করকমলে অঞ্জলি দেয়ার মত সমর্পণ করলেন ।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন বীরচন্দ্র । ইতিমধ্যে রাধারমণ ঘোষ আর মহিমও উপস্থিত হয়েছেন । সদ্যউপহার পাওয়া 'কাব্যগ্রন্থাবলী' বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ ৪৬৯ পৃষ্ঠায় এসে থমকে পড়লেন বীরচন্দ্র । রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ বরং গান হোক । আপনিই এই গানটি গেয়ে শোনান আমাদের, 'তোমাহীন কাটে দিবস হে প্রভু' । রবিবাবু কাঁচুমাচু কণ্ঠে বললেন, গানটা আমার ভালো করে গলায় তোলা নেই । তাছাড়া আপনার মত সঙ্গীতবিশারদের সামনে গাইতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে ।

বীরচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, কে বলল আমি সঙ্গীতবিশারদ । আমি বিশারদ-টিশারদ কিছু নই । গান শুনতে আমার ভালো লাগে, এই যা ।

বীরচন্দ্র বললেন, নিন, এবার শুরু করুন । রাধারমণ ঘোষ বসলেন তবলা নিয়ে । হারমোনিয়ামে হাত রাখলেন মহিম । মহারাজা বীরচন্দ্র কোলে তুলে নিলেন পাখোয়াজ । রবিবাবু আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠার জন্য নিচু স্বরে গলায় সুর খেলাতে শুরু করলেন । বীরচন্দ্র তাঁর বাঁ হাতটি প্রসারিত করে আঙুলের মাধ্যমে সুরলহরির ঢেউ তুলে বললেন, 'তোমাহীন কাটে দিবস হে প্রভু' — গানটি হবে বাগেশ্রী রাগে, আড়াঠেকা । বীরচন্দ্রের কথামত বাগেশ্রী রাগে আড়াঠেকায় পুরো মনপ্রাণ ঢেলে রবিবাবু গানটা গাইতে শুরু করলেন

তোমাহীন কাটে দিবস হে প্রভু,
হায় তোমাহীন মোর স্বপন জাগরণ
কবে আসিবে হিয়া মাঝারে ?

বার দুই গানটির কলি ঘুরেফিরে গাইবার পর রবিবাবু যখন গলাকে খাদে নামিয়ে এনেছেন প্রায়, তক্ষুণি সবাইকে অবাক করে দিয়ে মহারাজা বীরচন্দ্র নিজের গলায় গানটিকে তুলে এনে রাগ অক্ষুণ্ণ রেখে নিখাদ কণ্ঠে শুরু করলেন গানটির খড়ি বোলি তর্জমা 'তুম বিন কৈসে কাটে দিবস হে প্রভু'। রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সবাই বিস্ফারিত চোখে মহারাজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বীরচন্দ্র মিটিমিটি হাসতে হাসতে সুরের পর সুর ভেঁজে চলেছেন, 'তুম বিন্ কৈসে কাটে দিবস হে প্রভু'।

গান থামলে রবিবাবু অবাক হয়ে বললেন, আপনি এরকম চমৎকার কি করে গান ? এতো আমারও প্রশ্ন, বীরচন্দ্র হেসে বললেন, আপনি এরকম চমৎকার গান লেখেন কি করে ?

রবিবাবু ও বীরচন্দ্র হো হো করে দু'জনেই হেসে উঠলেন। গানের পর এবার বিরতি। এই ফাঁকে চা এল। কাব্যগ্রন্থাবলী বইটি বীরচন্দ্রের দারুণ পছন্দ হয়েছে। তবে তার মূল্য পঁচিশ টাকা দেখে তিনি খুবই দুঃখ পেলেন। তাঁর মনে হল, একটা কবিতার বইয়ের দাম পঁচিশ টাকা খুবই বেশি। এ দেশে অনেক রসিক কাব্যপিপাসু আছে যারা এত টাকা দিয়ে বইটি কিনে পড়তে পারবে না। অথচ না পড়তে পারলে রবিবাবুর মত বিরল প্রতিভা অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে। বীরচন্দ্র খানিকটা চিন্তা করে বললেন, আপনি লিখুন। আমি কলকাতায় ফিরে এক লক্ষ টাকা দিয়ে একটা প্রেস কিনব। সেই প্রেসে শুধু আপনার অলংকৃত কবিতার সংস্করণ ছাপা হবে। আপনার বইয়ের কোন দাম থাকবে না। বিনামূল্যে আমি বিতরণ করব আপনার বই বাংলাদেশে। ভালো জিনিসের দাম কখনও অর্থমূল্যে নিরূপণ করা যায় না। আমি চাই, আপনার কবিতা লোকের মুখে মুখে ফিরুক। আপনার বই ঘরে ঘরে শোভা পাক।

নিজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথ লজ্জায় আরও ম্রিয়মান হয়ে গেলেন। রবিবাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, আপনি আমাকে অধিক স্নেহ করেন, তাই আমার সম্পর্কে আপনার উচ্চাশা। আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমাণ কম এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করত। কিন্তু আপনি একমাত্র তার ব্যতিক্রম। প্রথম থেকে আমাকে সাহস এবং উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। মাঝেমাঝে আমার ভয় হয়, আমি এর যোগ্য কিনা।

দেখুন জহুরী জহর চেনে বলে একটা কথা আছে। বীরচন্দ্র প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, আমি একজন জহুরী। খাঁটি জহর চিনতে আমার ভুল হয় না।

হঠাৎ কাশির দমক উঠলে বীরচন্দ্র কথা থামিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। কাশতে কাশতে তাঁর দু'চোখে জল চলে এল। একসময় হাত সরালে দেখা গেল বীরচন্দ্র শরীরের ভেতরের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছেন। শত চেষ্টা করেও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ঢাকতে পারছেন না। যতটা সম্ভব কষ্টকে চেপে রেখে বীরচন্দ্র ম্লান হাসলেন। বললেন, মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়। যদি আমি আর না বাঁচি তবে কি হবে ? আমার ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বীরচন্দ্র স্বগতোক্তির মত বিড়বিড় করে বলতে শুরু করলেন

রবিবাবু, 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে 'আপনার একটা কবিতা আছে—'প্রাণ'। কবিতাটি আমার খুব প্রিয়। মৃত্যুভাবনা আমাকে গ্রাস করে ফেললে আপনার কবিতাটি আমি আবৃত্তি করি।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!

কবিতাটি পাঠ করলে মনে বল পাই। বুকে ভরসা জাগে। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছে, আমার অসুখের চিকিৎসা নেই। আমার তো মনে হয় মানুষের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে মৃত্যু পিছু হঠতে বাধ্য। আপনার কবিতা পাঠ করলে ইচ্ছাশক্তি দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। বাঁচতে সাধ জাগে। ইচ্ছে হয় অনন্তকাল বাঁচি।

অন্যান্যদিনের মত আজকের আসর দীর্ঘায়িত করা যাবে না। কেননা রবিবাবু কাল ভোরে কলকাতা রওয়ানা হয়ে যাবেন। মহারাজার আমন্ত্রণে এসে তাঁকে আগে চলে যেতে হচ্ছে বলে তিনি খুবই দুঃখিত। পৌষমাস চলে আসছে। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব। এবারকার আয়োজন অন্যান্যবারের চেয়ে আরও বেশী জাঁকজমক এবং আড়ম্বরপূর্ণ হবে। রবিবাবুকে এই উৎসবে স্বয়ং উপস্থিত থাকতে হয়। তিনি নিজে সমস্ত ব্যবস্থাকে সফল করতে অমানুষিক পরিশ্রম করেন। এবারের অনুষ্ঠানটি হল ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব। উৎসবে চারপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে সাধক বাউলেরা আসেন,আর আসেন শহরের ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এটিকে একটি উচ্চনীচ ভেদাভেদ ভুলবার মিলনোৎসব বললেই সঠিক বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ দিনটি শান্তিনিকেতনে থাকবেনই। শত কাজ থাকলেও তা ফেলে তিনি শান্তিনিকেতনে চলে আসবেন সেদিন।

আজকের আসরটি জমে উঠেও জমবার সুযোগ পেল না। বিদায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গাত্রোত্থান করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলে বীরচন্দ্র প্রতিদিনের মত আজও তাঁকে এগিয়ে দিতে এলেন। রবিবাবু বাধা দিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার শরীর ভাল নেই। আপনাকে আসতে হবে না।

বীরচন্দ্র ম্লান হেসে বললেন, রবিবাবু, পাছে অলসতা এসে কর্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সে ভয় করি। আপনি আমাকে বাধা দেবেন না।

মহারাজ, আপনার আভিজাত্য ও বংশের মহিমার পরিচয় পেয়ে আমি ধন্য হলাম। রবিবাবু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, কিন্তু আপনার শরীরটা যে ভাল নেই, তাই বলছিলাম, আপনি নামবেন না। আমাকে মহিমবাবু এগিয়ে দিয়ে আসবেন।

আজকে যে মহারাজার কি হল কে জানে। তিনি শুধু সিঁড়ি ভেঙে এগিয়ে দিতে নিচেই নামলেন না, বাড়ী থেকে বের হয়ে রবিবাবুর পাশাপাশি পাহাড়ি পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। বীরচন্দ্রের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে সঙ্গী হলেন মহিম আর রাধারমণ। বাইরে প্রচণ্ড শীত—ঘন

কুয়াশায় আবৃত চারদিক । বীরচন্দ্র ঠাণ্ডায় অল্প অল্প কাঁপছিলেন । তাঁর গায়ের আলোয়ান অসতর্কতার ফলে খানিকটা খসে পড়েছে। মহিম টেনেটুনে তা ঠিক করার চেষ্টা করছেন । কিন্তু মহারাজার সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ।

আপনি চলে গেলে আমি খুব একা হয়ে যাব । বীরচন্দ্র রবিবাবুকে পথটুকু এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, আর যখন আমি একা থাকি, আজকাল আমার কি হয়েছে জানি না, কেবলই মৃত্যুভাবনা আমাকে তাড়া করে ।

কার্সিয়াঙের প্রচণ্ড শীতে খোলা আকাশের নিচে মহারাজা বীরচন্দ্র আস্তে আস্তে পা ফেলে রবিবাবুকে পাহাড়ি পথ বেয়ে এগিয়ে দিচ্ছেন । মহারাজার পাশে এবং পেছনে রয়েছেন মহিম এবং রাধারমণ ঘোষ । হঠাৎ বীরচন্দ্র বললেন, জানেন রবিবাবু, আমার প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতীর মৃত্যুর পর আমাকে বিষাদ এবং মৃত্যুভাবনা গ্রাস করে ফেলেছিল, এখন প্রায় সেরকম অবস্থা আমার। এখন মনশ্চক্ষে আমি ভানুমতীকে দেখতে পাই যেন । সেদিন শোকাকুল হয়ে আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম, সে কবিতাটি বারবার মনে পড়ছে আমার।

নিজের কথা বলতে বলতে বীরচন্দ্র খানিকটা প্রগল্‌ভ হয়ে পড়েছিলেন, তাই নিজেকে সংযত করে বললেন, না থাক সেসব কথা । আপনি কলকাতায় পৌঁছেই তার করে পৌঁছ সংবাদ পাঠাবেন । নইলে আমি চিন্তা করব ।

রবিবাবু পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বললেন, থাক কেন, আপনার সেই কবিতাটি আমার শুনতে ইচ্ছে করছে । আপনি যদি কবিতাটি শোনান তবে আমি খুব খুশি হবো । আপনার স্নেহের অধিকারে আমি এটুকু নিশ্চয়ই দাবি করতে পারি ?

বীরচন্দ্র মনে মনে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন । রাজকীয় গাম্ভীর্য মুহূর্তের মধ্যে খসে পড়ল । আরও পীড়াপীড়ি করার আগেই তিনি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে নিজের কবিতাটির একটি অংশ আবৃত্তি শুরু করলেন—

হেথা আমি আছি পড়ে
হৃদয়ের ভাঙ্গাঘরে
শুনিতেছি সারাদিন
জীবনের বেলা ।
যেন রে উপলদেশে
সাথীহীন একা বসে
জানি না ফুরাবে কবে
এ মরতের খেলা ।।

কবিতাটি আবৃত্তি করার শেষে বীরচন্দ্র একটা হাহাকার মেশানো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ।

দুঃখিত গলায় রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করছি। আপনার স্বকণ্ঠে স্বরচিত কবিতা শুনতে পেলাম । আপনি এত প্রচারবিমুখ, নিজের কাব্যপ্রতিভার কথা

কাউকে জানাতে চান না। অথচ আপনি এত অসামান্য কবিতা লেখেন, না শুনলে বিশ্বাস হবে না। আমি তো মনে করি, বাঙলা সাহিত্যে এত চমৎকার কবিতা এক্ষুণি খুব কম কবিই লিখতে পারেন।

বীরচন্দ্র নিজের প্রশংসায় খুবই বিব্রতবোধ করলেন। বললেন, ছি ছি ! কি বলছেন আপনি। আমাকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে অন্যদের ছোট করবেন না। আসলে আমি কবিতা লিখতে পারি না। লিখিও না। এটা হল স্ত্রীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সংলাপ, যা ছন্দ মিলিয়ে সাজানো।

মহারাজা প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, আচ্ছা রবিবাবু, আপনি তো অনেক কবিতা লিখেছেন। কবিরা দুঃখীর দুঃখ, বিরহীর বেদনা উপলব্ধি করতে পারে। আমার ঐ ক্ষুদ্র কবিতাটির সঙ্গে মিল আছে বা ঐরকম কাছাকাছি ভাবধারা নিয়ে যদি আপনার কোন কবিতা থাকে তবে বরং সেটি আমাকে শোনান। তাহলে দারুণ হবে।

রবিবাবু হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলেন। তারপর মন থেকে নিজের লেখা 'চিত্রা' কাব্যের 'দিনশেষে' কবিতার প্রথম এবং শেষ স্তবক দুটি আবৃত্তি করলেন—

দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী—
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
হাঁগো, এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।।

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি কোথা খুঁজে পাই মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচা কেনা ফেলে যাই এখনি—
যেখানে পথের বাঁকে গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী।।

রবীন্দ্রনাথ থামলে বীরচন্দ্র নিজে থেকে গুনগুন করতে লাগলেন, 'দিন শেষ হয়ে এল / আঁধারিল ধরণী / আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।'

রবিবাবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বীরচন্দ্র বললেন, দারুণ। আপনার তুলনা নেই। আপনাকে আমি দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করি। কথাটা বলতে বলতে মহারাজা বীরচন্দ্রের কাশির দমক

এল । তিনি কেবল কাশতে লাগলেন—কাশি আর থামে না । কাশতে কাশতে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন । চারপাশের হিমে তিনি শীতার্ত হয়ে কাঁপছিলেন । ধরাধরি করে তাঁকে সবাই আবার মহারাজার নিজের আবাসে নিয়ে এলেন । রবিবাবুও ফিরে এসেছেন । কিছুটা সুস্থির হয়ে বীরচন্দ্র চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর শয্যার চারপাশে মহিম, রাধারমণ এবং রবিবাবু উদ্বিগ্ন সটান দাঁড়িয়ে আছেন । ইশারায় সবাইকে যেতে বললেন তিনি । কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে । রবিবাবু বাইরের ঘরে অনেকক্ষণ বিমর্ষভাবে বসে রইলেন । শেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে উঠতে হল, কেননা ঘরে গিয়ে গোছগাছ করতে হবে । কাল সকালে কলকাতার ট্রেন ।

পরদিন বীরচন্দ্রের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটল । তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটুকু তাঁর কাটছে না । মাঝেমাঝে চোখ খুলে তিনি কাকে যেন খুঁজছেন । মহিম এবং রাধারমণ খুব ভেঙে পড়েছেন । স্থানীয় ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে মহারাজা বীরচন্দ্রকে এই অবস্থাতেই কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হল । কলকাতায় এসেও অবস্থার কোন উন্নতি হল না । শত চেষ্টা সত্ত্বেও মহারাজা বীরচন্দ্র সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেলেন । কলকাতার কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সাঙ্গ হল । রবিবাবু শ্মশানের পাশে নীরবে বয়ে চলা আদিগঙ্গার পাড়ে অশ্রুসজল চক্ষে বসে রইলেন । মহারাজার দেহাবশেষ পঞ্চভূতে লীন হলে রবিবাবু সবার শেষে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ফিরে এলেন ।

কিছুতেই রবিবাবুর মন বসছেনা সংসারের কাজকর্মে । মহারাজা বীরচন্দ্রের কত সাধ স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেল—কেন এমন হয় ? মহারাজার বাঁচার খুব ইচ্ছে ছিল অথচ মৃত্যু তাঁকে সেই সুযোগ দিল না ।

এদিকে শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের ব্রহ্মোৎসব এসে পড়ছে । রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় অথচ তিনি সেখানে এখনও যাননি । শান্তিনিকেতন থেকে ক্ষিতীন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এলেন কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ।

ব্রহ্মোৎসবের আর মাত্র দু'দিন বাকি । রবীন্দ্রনাথ ঘরে উন্মনা বসে আছেন । তাঁর দৃষ্টি দূরে কোথায় যেন নিবদ্ধ । শান্তিনিকেতন থেকে আগত সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে রবিবাবু কোন কথা না বলে সেদিনের (১৯শে ডিসেম্বরের) 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকাটি তাদের একজনের হাতে তুলে দিলেন । পত্রিকাটি লিখেছে — 'ত্রিপুরার হিজ হাইনেস মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য গত শুক্রবার দিন তাঁর কলকাতার এক নং লিটল রাসেল স্ট্রিট বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ । তিনি যদিও ব্রাইট্স ডিজিজে ভুগছিলেন, তবে তাঁর মৃত্যুর আপাত কারণ হল নিউমোনিয়া যা তিনি কয়েকদিন আগে কার্সিয়াঙে ঠাণ্ডা থেকে বাধিয়েছিলেন ।'

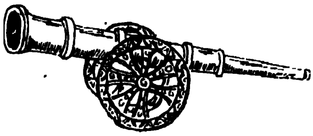
রবিবাবু চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে বললেন, তোমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে যাও । নিজেরা এবারকার বাৎসরিক ব্রহ্মোৎসবটি করে ফেলো । মহারাজা বীরচন্দ্র ছিলেন আমার কবি-

জীবনের পিতৃস্বরূপ । তাঁর বিয়োগ আমার পক্ষে পিতৃবিয়োগের তুল্য । এখন আমার কালাশৌচাবস্থা। আমার যা মনের পরিস্থিতি, আমি শান্তিনিকেতন যেতে পারছি না । শোনো, এবারকার ব্রহ্মোৎসবে কোন জৌলুস করো না । আতসবাজি পোড়ানো, যাত্রাভিনয় ইত্যাদি ব্যয়বহুল ব্যাপারগুলো এ বছর বাদ দাও । আমার ইচ্ছে, ব্রহ্মোৎসবটি এবার খুবই নিরাড়ম্বর হোক ।

শান্তিনিকেতন থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা চলে গেলে রবিবাবু আবার শূন্য দৃষ্টি মেলে দূরের পানে তাকিয়ে রইলেন । মহারাজা বীরচন্দ্রের মৃত্যু তাঁকে ভীষণভাবে বিমূঢ় এবং বিহ্বল করে রেখেছে । রবীন্দ্রনাথের কেবলই মনে হচ্ছে, সেদিন যদি বীরচন্দ্র কার্সিয়াঙে খোলা আকাশের নিচে শীতের রাতে তাঁকে এগিয়ে দিতে না আসতেন, তবে হয়তো তাঁর ঠাণ্ডা লাগত না । তাহলে হয়ত নিউমোনিয়া হত না । মহারাজা হয়ত আরও বেশীদিন বাঁচতেন । মহারাজার মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রকারান্তরে দায়ী মনে হয় তাঁর । একটা অপরাধবোধ রবিবাবুকে সেদিন থেকে নিঃশব্দে যেন অনুসরণ করে চলেছে ।

মুহূর্তের মধ্যে মনের ভেতর একটি অন্য ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রবিবাবুর । রবিবাবুর মনে হল, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছিলেন, এ দেশে মহারাজা বীরচন্দ্রের চিকিৎসা করার কিছু নেই । মহারাজ যে আর বেশীদিন বাঁচবেন না, সে কথাটুকু ডাঃ সরকার ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে বলেছিলেন । তিনি বলেছিলেন, যদি কিছু সাধ-আহ্লাদ এখনও অপূর্ণ থাকে তবে তা মিটিয়ে নিন । কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্রাইট্স ডিজিজ থেকেই তাঁর জীবনীশক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছিল । ঠাণ্ডা থেকে নিউমোনিয়া, একটা নিমিত্তমাত্র । মৃত্যু যেখানে অমোঘ,সেখানে কোন তাৎক্ষণিক নিমিত্তের জন্য অপরাধবোধের গ্লানিতে নিজেকে জর্জরিত করা সমীচীন নয়।

সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এনে এভাবে নিস্ফল সময় কাটানোর কোন অর্থ আছে কিনা—প্রশ্নটি নিজেকে নিজে করলেন রবিবাবু । সহসা নিজেরই অন্তরে তিনি তার উত্তরও খুঁজে পেলেন মনে হল । মহারাজা বীরচন্দ্র তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন । সেই আশীর্বাদের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে তাঁকে । এজন্য নিরলস অধ্যবসায় চাই । উল্টো অবসাদ এবং বিষাদে নিজেকে নিমজ্জিত করে রাখা এক অর্থে হঠকারিতা । শৈথিল্য এবং বিষাদকে এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে মহারাজা বীরচন্দ্রকে স্মরণে রেখে রবিবাবু কাগজকলম নিয়ে আবার লিখতে বসলেন।



দর্পণে কার মুখ

এক

আজ দিনটা মনে হচ্ছে খুব শুভ। মাঝেমাঝেই ডান চোখটা লাফাচ্ছে। ডান চোখ লাফানো মানে মনস্কামনা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা। তাছাড়া গঙ্গার ঘাট ধরে বড়লাট সাহেবের বাড়ীতে আসার সময় সমরেন্দ্র দেখেছেন দুটি দেহাতি স্ত্রীলোক নদী থেকে ঢেউ দিয়ে কলসিতে জল ভরছে। এটাও মাঙ্গলিক সংকেত।

সমরেন্দ্র এখন বসে আছেন বড়লাট সাহেবের বিরাট প্রাসাদোপম বাগানবাড়ীর পেছনের দিকে ফুলের বাগিচায়। খবর এসেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই লেডি ডাফরিন আসছেন। সমরেন্দ্র আর একবার মনে মনে সমস্ত কিছু রিহার্সাল দিয়ে নিলেন লেডিকে কি করে বলবেন কথাটা। লেডি ডাফরিনের সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রর পরিচয় ও যোগাযোগ খুবই আকস্মিক এবং অবিশ্বাস্য। কলকাতার তাবড় তাবড় ধনাঢ্য অভিজাতরা যেখানে লেডির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য হন্যে হয়ে মরছেন, সেখানে ত্রিপুরার মত অখ্যাত ছোট রাজ্যের রাজপুত্রের সঙ্গে লেডির পরিচয় ও সখ্যতা অনেকের কাছে ঈর্ষার কারণ। সমরেন্দ্র আগরতলা থেকে যখনই কলকাতায় আসেন একবার লেডি ডাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুশলাদি বিনিময় করে যাবেনই। এমনিতে লেডি খানিকটা চাপা, কথা কম বলেন। চেহারাটা তুলতুলে পুতুলপুতুল মত—বয়সে প্রায় সমরেন্দ্রর সমবয়সী। বন্ধুত্ব এবং সখ্যতা গড়ে ওঠার দুজনের মধ্যে এটাও হয়ত একটা কারণ। ইণ্ডিয়ায় এসে কলকাতার জলবায়ুতে তিনি বেশ কাবু। ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন রাজ্যপাট নিয়ে সদা ব্যস্ত, নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই তাঁর। লাটসাহেবের বিরাট বাড়ীতে লেডি একাকী নিঃসঙ্গ। এখানে যখনতখন বাইরে বেরোতে পারেন না তিনি। কথা বলেও এখানে সুখ নেই। ইংলিশ অনেকেই বোঝে না। যারা বোঝে তারা জানে শুধু পুঁথিপত্রে ছাপা ইংলিশ। কথার ইংরেজী আর ছাপার ইংলিশ যে এক নয়, সেটাই অনেকের মাথায় ঢোকে না।

এতদিন ধরে যে ভয় করে আসছিলেন তাই এবার হল বুঝি। বিকেল হলেই লেডির শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করে। গায়ে একটু তাপ আসে মনে হয়, সঙ্গে অল্পস্বল্প কাঁপুনি। এগুলো নাকি ম্যালেরিয়ার লক্ষণ। এদেশে ম্যালেরিয়া কাউকে একবার ছুঁয়ে দিলে তারপর

তিলে তিলে কফিনের দিকে পা বাড়ানো ছাড়া নিস্তার নেই। ডাক্তার, কবিরাজ, বদ্যিকে গুলে খাওয়ালেও কিছু হবার নয়। লেডি ডাফরিনের স্বভাবতই মন ভালো নেই। তিনি ইংল্যাণ্ডে পালাতে পারলে বাঁচেন। ভাইসরয়কে একাধিকবার মৌখিক নোটিশ দিয়েছেন। লেডি ডাফরিনের মন পড়ে থাকে লণ্ডনের থিয়েটার পাড়ায়। লণ্ডনের অপরাহ্নে ঢাউস দামি ফারের কোট গায়ে দিয়ে শেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়েট নাটক দেখতে গিয়ে প্রাক্তন প্রেমিকের হাতে হাত রেখে চোখে চোখ রাখার স্মৃতি লেডিকে এই কলকাতায়ও তাড়া করে। তিনি বিকেল হলেই বিষণ্ণতায় ডুবে যান। লণ্ডন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মনে হচ্ছে লেডি ডাফরিন একই সঙ্গে ম্যালেরিয়া এবং বিষাদ রোগে ভুগছেন। ডাক্তাররা বলেছেন, ম্যালেরিয়া সারানো সম্ভব তবে বিষাদ রোগ বা ডিপ্রেশন সারানো তাদের নাগালে বাইরে।

ডিপ্রেশন সারানোর একমাত্র ওষুধ হলো লর্ড ডাফরিনকে অনেক বেশি সময় দিতে হবে তাঁর স্ত্রীর জন্য, যা কিনা বর্তমান ভারতবর্ষের জটিল অস্থিরতার সময়ে বড়লাটের পক্ষে দেয়া একেবারেই অসম্ভব।

লেডি ডাফরিন বুঝেছেন, নিয়তি তাঁর প্রতি বিরূপ। এখনই যদি লণ্ডন ফিরে যেতে তিনি না পারেন তবে হয়ত কোনদিনই তাঁর আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। কলকাতা শহরের পত্তনকারী জব চার্নকের মতই তাঁকেও এখানকার কোন ধুলিধূসরিত সেমিটারিতে চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকতে হবে। এদিকে যত দিন যাচ্ছে ততই বিষণ্ণতা গ্রাস করে ফেলছে লেডি ডাফরিনকে। দিনকয় লেডি বড়লাটকে হুমকি দিয়েছেন, আমি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে চাই, তুমি যাও আর না যাও। হুমকির একটা অর্থ হল বিবাহবিচ্ছেদও যদি অনিবার্য হয়ে ওঠে এর ফলে, তাতেও লেডি দুঃখিত নন। ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন নিজেকে অসহায় বোধ করেন। একদিকে সুন্দরী স্ত্রীর মনরক্ষা অন্যদিকে রাজকর্তব্য। লাটসাহেব স্ত্রীর ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে দিয়ে বলেন, আমাকে কিছুটা সময় দাও হানি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

লেডি ডাফরিনের চুম্বন অঙ্কিত ওষ্ঠ প্রথমে অভিমানে ফুলে ওঠে এবং পরে বেদনায় ও বিষাদে নীল হয়ে যায়। লর্ড ডাফরিন মুখে সব খুলে না বললেও মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। তিনি ফিরে যাবেন ইংল্যাণ্ডে, সেজন্য তদ্বির এবং দরবার শুরু করেছেন। মনে হয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট তাঁর আর্জি পৌঁছে গিয়েছে ইতিমধ্যে। যেকোন দিনই তাঁর বদলির সংবাদ সাগরপার থেকে আসতে পারে। একটা মাটির ঢেলা দেশকে ভালবাসার চাইতে রক্তমাংসে, আনন্দ-বিষাদে গড়া স্ত্রীকে ভালোবাসা এবং তাঁর মনকে জয় করতে পারা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি স্ত্রীকে হারাতে চান না, যেকোন মূল্যে তাঁকে ধরে রাখতে চান।

সমরেন্দ্র বাগিচায় বসে থাকতে থাকতে লক্ষ করলেন দুটি শালিক উড়ে এসে একটি টিউলিপ ফুলগাছের পাশে টুকটুক করে বসল। বসে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে খুনসুটি শুরু করে দিল। দুটি শালিকও একসঙ্গে দেখা সৌভাগ্যের দ্যোতক। আজ দিনটা সবদিক দিয়ে ভালো। লেডির সঙ্গে আগেকার মোলাকাতে সমরেন্দ্র ভারতবর্ষের সাহিত্য, কৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে ইংরেজী ফার্সিতে অনর্গল কথা বলেছেন। লেডি ডাফরিন সমরেন্দ্রর জ্ঞানের বহর দেখে অভিভূত

হয়ে গিয়েছেন । ইংল্যাণ্ডের এই বয়সী ছোকরারা এর ভগ্নাংশও জানে না । এরা জানে আমোদ-আহ্লাদ আর রক্তমাংসের জীবনকে উপভোগ করার নানা কারুকলা । লেডি ডাফরিন সমরেন্দ্রকে পছন্দ করেন । সমরেন্দ্র দেখতে যেকোন একজন শ্বেতকায় ইংলিশ যুবার মতই। ছিপছিপে, লম্বা টিকোলো নাক, টান টান শরীরে এতটুকু মেদ নেই । আগে না বলে দিলে সমরেন্দ্রর চেহারা ছবি দেখে যে কেউ মনে করতে পারে তিনি বুঝি ইংল্যাণ্ডের ডিউক অব এডিনবরা অথবা প্রিন্স অব ওয়েলস । সমরেন্দ্র যখন শালিকের খুনসুটি দেখতে মগ্ন, তখন পেছন থেকে নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়ে চমকে দিয়ে লেডি ডাফরিন বললেন, 'হ্যালো'। চকিতে তন্ময় ভাবটা ভেঙে যেতেই আড়ষ্টভাবে চেয়ার থেকে উঠে সমরেন্দ্র লেডিকে অভ্যর্থনা জানালেন । লেডি নিজের চেয়ারটা টেনে সমরেন্দ্রর আরও কাছে এসে বসলেন । সমরেন্দ্র কিছুটা ঝুঁকে নিচু হয়ে লেডি ডাফরিনের হাতে একটা উপহার তুলে দিলেন । উপহারটির ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল এটি দুর্দান্ত নিখুঁত কাজ করা একফালি বস্ত্রখণ্ড । লেডি ডাফরিন বিস্ময়ের সঙ্গে বস্ত্রখণ্ডের সূক্ষ্ম কাজগুলো দেখতে দেখতে অবাক হয়ে বললেন, ওয়াণ্ডারফুল ! এটা কি ?

ম্যাডাম, এটা একটা রিয়া । মানে হল বক্ষবন্ধনী । আমাদের ত্রিপুরায় মেয়েরা এই রিয়া দিয়ে বুক বাঁধে । রিয়া নিয়ে দারুণ সব গল্প চালু আছে আমাদের দেশে । ত্রিপুরার মহিলারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য রিয়া নিজেরা বানায় । যে যত কারুকার্যখচিত রিয়া বানাতে পারে পাত্রী হিসেবে তার কদর তত বেশী ।

অবাক বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে লেডি ডাফরিন বললেন, ইন্টারেস্টিং। তার মানে কি এই, যে মেয়ে রিয়া বুনতে পারবে না তার বিয়ে হবে না । পুওর গার্ল !

সমরেন্দ্র হেসে বললেন, কথাটা পুরোটা না হলেও আংশিক সত্যি। আমাদের ত্রিপুরার এক রাজা, তাঁর নাম সুবরাই, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ত্রিপুরার সুন্দরী মেয়েরা যারা নূতন নূতন দারুণ সুন্দর রিয়া বানাতে পারবে তাদের তিনি বিয়ে করবেন । রাজাকে বিয়ে করে কে রাণী না হতে চায়! দেশে রিয়া বানানোর ধুম পড়ে গেল । এতে রিয়া শিল্পের উন্নতি হল। রাজা রোজ একজন করে রিয়া-সুন্দরীকে বিয়ে করতে লাগলেন । রাজার স্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়াল দু'শ চল্লিশ ।

লেডি ডাফরিন সমরেন্দ্রকে থামিয়ে বললেন, ওয়াইভসের সংখ্যা হল টু হ্যান্ড্রেড এন্ড ফোরটি ! আই কান্ট বিলিভ ইট ! সমরেন্দ্র, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি, তুমি কি বিবাহিত ?

সমরেন্দ্র মুচকি হেসে বললেন, ম্যাডাম, আগে তো গল্পটা শেষ করি । পরে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব । রাজার দু'শ চল্লিশটি বিয়েই শেষ নয়, তারপরও দেখা গেল একজন যুবতী একটা রিয়া নিয়ে এসেছে রাণীর দাবীদার হয়ে। তার রিয়াটি এতই শিল্পগুণমন্ডিত যেন মনে হবে এটি বুঝি মাছির পাখনা দিয়ে বানানো। রাজা অবাক হয়ে বললেন, সুন্দরী,তুমি

এমন রিয়া কি করে বানালে ! মাছি তো উড়ে উড়ে বেড়ায় ।এক জায়গায় স্থির থাকে না । রিয়াতে মাছির পাখনা কি করে এত নিখুঁত করে বুনলে ! সূর্যের আলো মাছির পাখনায় পড়লে যেমন ঠিকরে ওঠে রঙের বাহার, তেমনি রঙ্গিলা হয়েছে তোমার অপূর্ব রিয়া। মেয়েটি তখন বলল, আমাদের বাড়ীতে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় একটি মাছি কেবল বসে থাকে, নড়ে না ।তাড়ালেও আবার ফিরে এসে সেখানে বসে ।আমি তাকে দেখে দেখে এই রিয়া বুনেছি। রাজা মেয়েটির বাড়ী গিয়ে মাছিটি যেখানে ঠায় বসে থাকে সেখানে খুঁড়ে দেখলেন একটি সাপের মৃতদেহ । সাপটি ছিল একটি অভিশাপগ্রস্ত স্বর্গের গন্ধর্ব এবং রাজার বন্ধু । সাপ রাজাকে কথা দিয়েছিল, এক একদিন এক এক রকমের রিয়া বানানোর বিদ্যা সুন্দরীদের শিক্ষা দেবে সে ।কিন্তু যেহেতু তাকে মেরে ফেলা হয়েছে তাই রিয়া বানানোর দুর্লভ বিদ্যা ত্রিপুরাতে লুপ্ত হয়ে গেলো । রাজা মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। যেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল রাজার বন্ধু সাপটিকে সেখানে ফুটল একটি ফুল — যার নাম হল খুম্পুই ।খুম্পুই ত্রিপুরার উপত্যকার লিলি।

রিয়া বা বক্ষবন্ধনীর গল্প সমরেন্দ্রর কাছে শুনতে শুনতে লেডি ডাফরিন নিজেকে এক অজানা দূরদেশে যেন হারিয়ে ফেলেন । যে দেশের মেয়েরা বুক বাঁধে রিয়া দিয়ে, খোঁপায় গোঁজে খুম্পুই ফুল ।

গল্পটা শেষ হতেই লেডি ডাফরিন রিয়াটা হাতে নিয়ে খানিকটা আড়ালে চলে গেলেন। তারপর স্কার্ফের ওপরই রিয়াটাকে আঁটোসাঁটো করে বেঁধে ফিরে এসে সমরেন্দ্রর সামনে দুষ্টু হেসে থমকে দাঁড়ালেন । সমরেন্দ্র উঠে একটা টিউলিপ ফুল ছিঁড়ে এনে লেডি ডাফরিনের চুলে গুঁজে দিলে তিনি হাসিখুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন ।দীর্ঘদিন বাদে সম্ভবত এই প্রথম লেডিকে প্রাণবন্ত এবং উচ্ছলতায় ভরপুর বলে মনে হল ।পুরো দৃশ্যটা লর্ড ডাফরিন দূরবীন চোখে দিয়ে লাটসাহেবের দোতলার ব্যালকনি থেকে দেখলেন । দেখে তাঁর মন ভরে গেল। কলকাতা তাহলে লেডির ভাল লাগছে। এইসব ইয়াংম্যানরা এলে লেডির বিষাদ ভাবটা অনেকটা কেটে যাবে। হয়ত একদিন ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত তিনি বদলাতেও পারেন।

লেডি ডাফরিন ফুলের বাগিচায় বসে বাইরের নীলিমার পানে নির্বাক তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দূরে বয়ে যাচ্ছে নীরবে গঙ্গা। জেটিতে জাহাজের ভোঁ শোনা যাচ্ছে ।পড়ন্ত ম্লান অপরাহ্নে হয়ত এই জাহাজটি লন্ডন অভিমুখে রওনা হচ্ছে এখন । লেডি ডাফরিন আলতো করে সমরেন্দ্রর হাতে হাত রেখে বললেন, ডার্লিং, জানো তো আমি লন্ডনে ফিরে যাবো । তোমাদের লাটসাহেব যাক আর না যাক, আমার এখানে একেবারে ভাল্লাগে না ।দমবন্ধ হয়ে আসে ।

চমকে উঠলেন সমরেন্দ্র । লেডি ডাফরিন যদি চলে যান তবে সমরেন্দ্রর সমূহ ক্ষতি । সমস্ত কিছু ভেস্তে যাবে ।ত্রিপুরার রাজ্যপাট আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যাবে না । লেডি থাকতে থাকতে সব গুছিয়ে নিতে হবে।

সমরেন্দ্র খুব সংকোচের সঙ্গে বললেন, ম্যাডাম, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ চাই । আমি আশা করছি আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন । নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না আপনাকে বিব্রত করি । কিন্তু আমি নিরুপায়, আর এদিকে সময়ও চলে যাচ্ছে। আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন বলেই আপনার স্নেহ এবং ভালোবাসার সুযোগটুকু নিচ্ছি, এজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

লেডি ডাফরিন কিছুই বুঝতে পারছেন না। কি ধরনের সাহায্য চাইছে সমরেন্দ্র ? তাও আবার ব্যক্তিগত । সেটা আবার কি ? এদেশের লোকজন খুব রহস্যময়, এরা কি বলতে গিয়ে কি বলতে চায় আগে থেকে বোঝা যায় না। সমরেন্দ্র তো একথা বলবে না যে, যেয়ো না ম্যাডাম, আমি তোমায় ভালবাসি । লেডি ডাফরিন সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকেন । অবশ্য সমরেন্দ্র ব্যক্তিগত ব্যাপার যা বলতে চেয়েছেন তা নিতান্তই বৈষয়িক । সমরেন্দ্রর বাবা মহারাজা বীরচন্দ্র মারা গেলে রাধাকিশোর রাজা হন । সমরেন্দ্রর রাজা হওয়ার দাবী সেদিন অগ্রাহ্য হয়েছিল মূলত একটি কারণে। তা হল সমরেন্দ্র মহারাজা বীরচন্দ্রের প্রধান মহিষী ভানুমতীর পুত্র হলেও বয়সে তিনি ছিলেন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাধাকিশোরের চেয়ে ছোট । রাধাকিশোর যুবরাজ পদ থেকে মহারাজার আসন অলঙ্কৃত করার সময় সমরেন্দ্র ছিলেন বড়ঠাকুর । মানে হল যুবরাজের অকালমৃত্যু বা অবর্তমানে বড়ঠাকুরই মহারাজা হবেন । এটাই ত্রিপুরার উত্তরাধিকারের প্রচলিত আইন।

এক্ষুণি ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা হলেন রাধাকিশোর । শোনা যাচ্ছে, রাধাকিশোর তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার কথা ভাবছেন। বীরেন্দ্রকিশোর যুবরাজ বলে স্বীকৃত হলে সমরেন্দ্রর এবারও রাজসিংহাসনে আরোহণ করার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়ে যাবে। আগে একবার সমরেন্দ্রর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এবার আবার তাঁকে বঞ্চিত করার একটা চক্রান্ত চলছে । এ ব্যাপারে সমরেন্দ্র লেডি ডাফরিনের মাধ্যমে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে সুবিচার চান ।

লেডি ডাফরিন কলকাতায় এসে পদার্পণ করার পর থেকে কেবলই ক্ষমতা কাড়াকাড়ি এবং ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি যুদ্ধ বিগ্রহের কান্ডকীর্তি দেখে খুবই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। সমরেন্দ্রর প্রতি তাঁর দুর্বলতা রয়েছে। তাই যে ব্যাপারে তিনি কখনও নাক গলান না, সে ব্যাপারে যেহেতু সমরেন্দ্র রয়েছেন, সেজন্য সম্ভবত অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেডি ডাফরিন বললেন, ঠিক আছে। আমি দেখব কি করতে পারি।

গঙ্গার ঐ পাড়ে সূর্য অস্ত গেলে লাটসাহেবের ফুলের বাগিচায় আলো-আঁধারি নেমে এল। এমন সময় লর্ড ডাফরিন দোতলা থেকে নেমে এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমরেন্দ্রর কাঁধে হাত রেখে বললেন, হ্যালো ইয়াংম্যান, কেমন আছো ?

লর্ড ডাফরিনকে এত কাছে পেয়ে সমরেন্দ্র ভীষণ আড়ষ্ট বোধ করলেন। তবু মুহূর্তের মধ্যে আড়ষ্টতা কাটিয়ে সমরেন্দ্র বুকে বল সঞ্চার করে বললেন, মি লর্ড, আপনার কাছে

আমার একটা প্রেয়ার আছে।

চোখের কোণে তিরস্কারের ভাব এনে লেডি বললেন, তোমাকে নূতন করে কিছু বলতে হবে না । আমি তো বলেছি যা করার আমি করব। হ্যাভ ফেথ ইন মি।

সমরেন্দ্র নিজের ধৃষ্টতার জন্য মরমে মরে গেলেন। বললেন, আপনি ক্ষমা করবেন ম্যাডাম।

লর্ড ডাফরিন হাল্কা হেসে বললেন, ইয়াংম্যান, মহিলারা কখনও কাউকে ক্ষমা করেন না নিজে থেকে । ক্ষমাও তাদের ঘুষ দিয়ে আদায় করে নিতে হয় ।

লর্ড এবং লেডি ডাফরিন দু'জনে হেঁটে হেঁটে সমরেন্দ্রকে বাড়ীর সিংহ দরওয়াজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন । বিদায় মুহূর্তে লেডি ডাফরিন হেসে বললেন, সমরেন্দ্র, পরে যখন তুমি আসবে তখন আমার জন্য আগরতলা থেকে একটা খুম্পুই ফুল নিয়ে এসো । রিয়ার সঙ্গে আর যাই হোক, টিউলিপ ফুল মানায় না। খুম্পুই ফুল পেলে তোমাকে ক্ষমা করে দেবো।

দুই

মহারাজা রাধাকিশোর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন । যাকে সামনে পাচ্ছেন, তাকেই অশ্রাব্য গালিগালাজ করে যাচ্ছেন । ক্রোধে তাঁর চোখ দুটো প্রায় রক্তজবার মত দেখাচ্ছে, রাজপ্রাসাদে কেউ তাঁর সামনে যাচ্ছে না । এমনিতে রাধাকিশোর খুবই ধীর স্থির । কিন্তু আজ যে কি হল কে জানে । এত ক্রুদ্ধ হতে তাঁকে কেউ দেখে নি আগে কোনদিন ।

খবর পেয়ে কর্ণেল মহিম ঠাকুর ছুটে এসেছেন। হাঁফাতে হাঁফাতে মহিম ঠাকুর বললেন, মহারাজ আমাকে ডেকেছেন ?

রাধাকিশোর ভেংচি কেটে বললেন, মহারাজ আমাকে ডেকেছেন? তোরা সব থাকিস কোথায় ?

নিরুত্তর মহিম মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকাতে লাগলেন । কোথায় থাকিস-এর কোন উত্তর হয় না, কেননা মাত্র কালই রাত্রি দেড়টা দু'টো পর্যন্ত তিনি মহারাজার সঙ্গেই ছিলেন। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নৃত্যগীতের আসর বসেছিল রাজপ্রাসাদে । তবে এখন এই তোপের মুখে চুপচাপ থাকাই শ্রেয় । কিছু গালিগালাজের পর সব থিতু হয়ে এলে তখন দেখা যাবে । ততক্ষণ বোবা হয়ে থাকাই ভালো । কথায় আছে, বোবার কোন শত্রু নেই, তার কোন ক্ষতি হয় না ।

তুই কোন খবর রাখিস ? ব্যারিষ্টার জ্ঞান রায় বলে একটা লোক এসেছে আগরতলায়। গোপনে। রাধাকিশোর অসহিষ্ণু হয়ে তাকালেন মহিমের দিকে ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনেছি বড়ঠাকুর সমরেন্দ্র কর্তা তাকে আনিয়েছেন । ঢোক গিলে মহিম বললেন।

রাধাকিশোর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন । চিৎকার করে বললেন, হারামজাদা, যদি তুই জানতিস তবে আমাকে আগে বলিস নি কেন ?

মহারাজ, কত কিছুই তো জানি । সব কি আপনাকে বলা যায় ? মহিম নরম গলায় নিরুত্তেজভাবে বললেন কথাগুলো ।

রাধাকিশোর হাত পা এলিয়ে আরামকেদারায় কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন ।

আসলে সব হল বড়ঠাকুরের কান্ড । মহিম খানিকটা চুপচাপ থেকে আবার শুরু করলেন, আপনার রাজা হবার আগে এবং রাজা হবার পরে, আপনাকে শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেবেন না তিনি। মহারাজ, আপনি তো সবই জানেন । আপনাকে আর কি বলব ?

মহিম অর্ধপথে কথা থামিয়ে দিলেন । আরও কিছু বলার আছে, কিন্তু বললেন না । মহারাজার অভয় পেলে বলবেন । নিজে থেকে বললে, মহারাজার পছন্দ না হলে মহিমের গর্দানটা যাবে । কেউ তখন বাঁচাতে আসবে না ।

রাধাকিশোর বুঝলেন । বুঝে বললেন, খুলে বল সব কিছু ।

মহিম বললেন, মহারাজ, বড়ঠাকুর মণিপুর থেকে একজন ওঝাকে নিয়ে এসেছেন । পুরানো হাবেলীর বাড়ীতে তিনি অষ্টপ্রহর যজ্ঞ করছেন আপনার মৃত্যু কামনা করে, মারণ উচাটন, বশীকরণ তাবিজ কবজ কিছুই বাদ দিচ্ছেন না । আপনার অপঘাত এবং অকালমৃত্যু হলে বড়ঠাকুর ত্রিপুরার সিংহাসনে বসবেন, এই খায়েস দেখছেন ।

অত্যধিক রাগের মধ্যেও রাধাকিশোর হেসে ফেললেন। হাসি থামিয়ে বললেন, যাগ-যজ্ঞ তাবিজ কবচ করে যদি কাউকে মেরে ফেলা যেত তবে তো পৃথিবীর অনেক ইতিহাসই অন্যরকম হত। হা, হা ।

মহারাজ, আপনি এসব হাল্কাভাবে নিচ্ছেন । আসলে যতটা হাল্কা মনে হচ্ছে, ততটা নয়। আপনি হয়ত জানেন না, বড়ঠাকুরের প্ররোচনায় আপনার মাইনে করা পুরোহিত রাধালাল গোস্বামী আপনাকে বধ করার জন্য নীলমণি দেবতার চরণে নিত্য তুলসী দিচ্ছে। মহারাজ, এগুলো তুচ্ছ ব্যাপার নয় । অনেকসময় এগুলো ফলে যায় ।

রাধাকিশোর তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, এগুলো ছাড় । আসল কথা বল । ব্যারিষ্টার জ্ঞান রায় ব্যাটা এসেছে কেন আগরতলায়।

মহারাজ, সে অনেক কথা । মহিম গলা কেশে পরিষ্কারভাবে বলতে শুরু করলেন, আমি তো প্রায়ই কলকাতা যাই । কলকাতা থেকে শুনে এসেছি, বড়ঠাকুর কলকাতায় গিয়ে লেডি ডাফরিনের পায়ে পড়েছেন । একটা পুরোনো দিনের রিয়া উপহার দিয়েছেন । বড়লাটের

কাছে পৌঁছতে পারেননি, তাই লেডিকে ভজিয়ে ভাজিয়ে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চাইছেন। আলিপুর কোর্টে সিংহাসনের দাবী নিয়ে একটা কেসও ঠুকে দিয়েছেন। লেডিকে দিয়ে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনকে নরম করতে পারলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। কোর্ট কাছারি হল একটা বাহানা মাত্র।

কিছুক্ষণ থেমে আবার মহিম বলতে আরম্ভ করলেন, মহারাজ আপনার সর্বনাশ করার জন্য বড়ঠাকুর কিছুই বাদ রাখছেন না। যজ্ঞ করছেন, নীলমণির চরণে তুলসি দিচ্ছেন। লেডি ডাফরিনের পদসেবা করছেন, কোর্টে মামলা ঠুকছেন। অথচ আপনি জেনেশুনেও আপনার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটি টুঁ শব্দও করছেন না। কেবল ক্ষমা করে যাচ্ছেন, কেবল ক্ষমা করে যাচ্ছেন। ক্ষমারও তো একটা সীমা আছে মহারাজ।

তুই কি বলতে চাস। রাধাকিশোর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মহিমের দিকে তাকালেন।

মহিম আমতা আমতা করে বললেন, আমি আর কি বলব মহারাজ। যে কিনা এত অনিষ্ট করতে নেমেছে আপনার বিরুদ্ধে, আপনারও উচিত তাকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া। আমার তো মনে হয় যে আপনাকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় তাঁর প্রতি আপনার মোটেই দুর্বলতা থাকা উচিত নয়। আপনার উচিত নিজে নিশ্চিহ্ন হবার আগে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

আর একবার এই কথা মুখে আনবি তো তোর জিহ্বা আমি উপড়ে নেব। রাধাকিশোর হুংকার দিয়ে বললেন, সমরেন্দ্র আমার ভাই, হোক বৈমাত্রেয়। একই পিতৃরক্ত বইছে আমাদের শিরায় শিরায়। সমরেন্দ্র আমার ছোট। ছোট ছোট হতে পারে, আমি তো ছোট হতে পারি না।

অবসাদগ্রস্ত গলায় রাধাকিশোর বললেন, তবে হ্যাঁ, সমরেন্দ্রকে একটা শিক্ষা দেয়া উচিত। সমরেন্দ্রর শরীরে আঁচড়টি দিবি না। ঐ যে কি এক ব্যারিস্টারকে নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে আদালতের মামলার জন্য সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করতে, তাকে জেলে ঢুকিয়ে দে। তাতেই সমরেন্দ্র টেরটি পাবে।

মহারাজ, মহিম খুবই বিনীতভাবে বললেন, বড়ঠাকুরকেই যদি শিক্ষা দিতে হয় তবে বড়ঠাকুরকেই শিক্ষা দিন। অন্যকে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন না। এটা ঠিক হবে না। হিতে বিপরীত হতে পারে।

চোপ! রাধাকিশোরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি নির্মম গলায় আদেশ দিলেন, আমাকে তোরা শেখাতে আসিস না, আমি যা বলছি সেটাই আইন। ব্যারিস্টারকে গারদে পুরে ফেল, কয়েকদিন ঘানি টানুক, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন যা। হুকুম তামিল হল কিনা বিকেলে বলিস এসে।

মহারাজার মুখের ওপর কিছু বলা যাবে না। অথচ কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি। একজন ব্যারিস্টারকে কেউ যদি রাজ্যে ডেকে নিয়ে আসে, সেই ব্যারিস্টারকে বিনা দোষে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া গায়ের জোরের কথা। কোন আইনী কথা নয়। মহিম মহারাজার সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্কে না গিয়ে নতমুখে আবার বাড়ী ফিরে এলেন।

মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা না পেরোতেই কলকাতা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তার এলো, ব্যারিস্টার জ্ঞান রায়কে এক্ষুণি ছেড়ে দাও এবং ব্যারিস্টারের মত একজন গণ্যমান্য লোককে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করা হল কেন তার কারণ দর্শাও। অন্যথা অহেতুক হেনস্তার জন্য জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজের কৃতকর্মের জন্য গভর্নমেন্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

সকাল থেকে মহারাজার মেজাজ তিরিক্ষি। গভর্নমেন্টের তারবার্তা তাঁর নজরে এসেছে। এটাও সমরেন্দ্রর কাজ। সমরেন্দ্র আগরতলা থেকে কলকাতায় লাটভবনে টেলিগ্রামে ব্যারিস্টারের গ্রেপ্তারের খবর জানিয়েছে। সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান নিয়েছে। রাধাকিশোরের নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছেন সমরেন্দ্র। ব্যারিস্টার জ্ঞান রায় ছাড়া পেয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছেন। আলিপুরের আদালতের মামলায় রাধাকিশোরের কেস খুব দুর্বল হয়ে গেল। অন্যান্য উকিল ব্যারিস্টারেরা এখন একজোট। একজন সতীর্থ ব্যারিস্টারের অপমান মানে সবার অপমান। এমনও হতে পারে পুরো আদালতের উকিল-জজ-মোক্তার সবাই এককাট্টা হয়ে রাধাকিশোরের বিরোধিতায় নামতে পারে। আসলে সেদিন মাথা গরম করে ব্যারিস্টার ব্যাটাকে গ্রেপ্তার না করলেই ভালো ছিল। কর্ণেল মহিম সুপরামর্শই দিয়েছিল। কিন্তু কি যে হয়েছিল, রাগে যুক্তি-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল রাধাকিশোরের সেদিন।

ছুটতে ছুটতে মহিম এসে বিনীত করজোড়ে বললেন, মহারাজ, আমাকে ডেকেছিলেন ? রাগত স্বরে রাধাকিশোর বললেন, ডেকেছিলাম মানে কি ! তোরা থাকিস কোথায় ? ডাকলে কাউকে পাই না।

আজ্ঞে আমি রাজমন্ত্রীর সাথে একটা পরামর্শ করছিলাম। মহিম বিজ্ঞভাবে চিন্তান্বিত হয়ে বললেন।

ব্যারিস্টার জ্ঞান রায়কে গারদে পুরে মহারাজার মান-ইজ্জত যেতে বসেছে। কলকাতার সভ্য সমাজে তিনি আর মুখ দেখাতে পারবেন না। তাই মহিম ঠিক করেছেন তিনিই যাবেন কলকাতায়। গিয়ে সেখানে গভর্নমেন্টের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইবেন। বলবেন, ব্যারিস্টারকে গ্রেপ্তার করার পেছনে মহারাজার হাত নেই। মহারাজা রাধাকিশোর বরং না-ই করেছিলেন। কর্ণেল মহিমই বাড়াবাড়ি করে মহারাজের অজ্ঞাতে কাণ্ডটা বাধিয়ে বসেছেন। হঠকারি এই ঘটনার জন্য অন্য কেউ দায়ী নন, কর্ণেল মহিম স্বয়ং দায়ী।

মহিমের কথা শুনে রাধাকিশোর অভিভূত হয়ে পড়লেন। সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুই তাহলে আজই বিকেলে কলকাতা রওনা হয়ে যা। যেভাবে পারিস ব্যাপারটা মিটমাট করে আসিস।

কর্ণেল মহিম পা বাড়ালে রাধাকিশোর পেছন থেকে ডেকে বললেন, শোন ! সঙ্গে একটা রিয়া নিয়ে যাবি। সুযোগ পেলে লেডি ডাফরিনকে দিয়ে বলবি আমি উপহার হিসেবে পাঠিয়েছি।

মহিম ফিক করে হেসে বললেন, মহারাজ । লেডি এবং লর্ড ডাফরিন ইংল্যাণ্ডে চলে গিয়েছেন। এখন নতুন ভাইসরয় এসেছেন কলকাতায় । তাঁর নাম লর্ড কার্জন । মনে হচ্ছে, ভাইসরয় বদলের ফলে বড়ঠাকুরের লেডি ডাফরিনের মাধ্যমে লাটসাহেবের বাড়ীতে আনাগোনা বন্ধ হবে ।

শোন ! বেশি বকিস না । নিয়ে যা একটা সুন্দর রিয়া । লর্ড কার্জনের বৌকে দিস । রাধাকিশোর জোর দিয়ে বললেন কথাটা, বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রর সমস্ত জারিজুরি গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

মহিম চুপ করে থেকে পরে বললেন, মহারাজ, লেডি কার্জনকে রিয়া দিতে গেলে আপনাকে নিজে গিয়ে দিতে হয় । আমাকে দিয়ে দেওয়ালে মানায় না ।

রাধাকিশোরের পক্ষে নিজে গেলে সবদিক থেকে শোভন হয় সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । কিন্তু বাদ সেধেছে ভাষা । রাধাকিশোর একবর্ণ ইংরেজী বলতে পারেন না । সমরেন্দ্র তুখোড় ইংরেজী বলে আর চালিয়াৎও খুব । অনেক ভেবেচিন্তে রাধাকিশোর বললেন, এক কাজ কর । কলকাতায় যাওয়ার সময় তোর সঙ্গে বীরেন্দ্র আর ব্রজেন্দ্রকে নিয়ে যা । এরা ভালো ইংরেজী বলতে পারে । তাছাড়া লর্ড কার্জনের সঙ্গে বীরেন্দ্রকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসিস । এইসব ঝামেলা চুকেবুকে গেলে আমি আর দেরী করব না । বীরেন্দ্রকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করাব শীঘ্র । সমরেন্দ্রর মোক্ষম শিক্ষাটা হবে তখন ।

মহারাজা রাধাকিশোরের দুই পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর এবং ব্রজেন্দ্রকিশোরকে নিয়ে মহিম এলেন কলকাতায় । মহিম কয়েকদিন এখানে ওখানে ছুটোছুটি করলেন । একে তাঁকে ধরলেন। মহিমের একটা সুবিধে হল কলকাতায় এখন যাঁরা গণ্যমান্য লোক তাঁরা অনেকেই মহিমের সঙ্গে বাল্যকালে এক সঙ্গে পড়তেন । বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা প্রমথ মিত্র ছিলেন মহিমের হেয়ার স্কুলে সহপাঠী । এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংকে ফেল করার ফলে মহিমের কলেজে পড়াশুনা আর হয়নি বটে, তবে তিনি প্রায়ই প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী লেকচার শুনতে যেতেন । পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহিমকে খুব স্নেহ করতেন । মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী, নবাব আব্দুল লতিফের বাড়ী এবং অন্যান্য অনেকের বাড়ীতেও তাঁর যাতায়াত ছিল ।

ইতিমধ্যে কলকাতার পত্রিকায় একটা খবর ছাপা হল, মহিম ঠাকুর নামীয় একজন রাজপুরুষ ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোরের আদেশের অতিরিক্ত কার্য করিয়াই জ্ঞানবাবুকে ধরিয়া আনেন। তজ্জন্য মহারাজ দোষী নহেন, তিনিই তজ্জন্য শাস্তির যোগ্য । মহিম গভর্নমেন্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন । তাহার ফলে তাঁহার পাঁচশ টাকা জরিমানা এবং জ্ঞান রায়কে এক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল ।

মহিমের উপর ন্যস্ত প্রথম কর্তব্যটি তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করলেন । সবই পরিকল্পনা-মাফিক সুন্দরভাবে শেষ হল । এবার দ্বিতীয় কর্তব্যের পালা । কর্তব্যটি হল লর্ড কার্জনের সাক্ষাৎপ্রার্থী হওয়া এবং বড়ঠাকুরের জারিজুরি ভেঙে দেয়া । আর সবার শেষে, লেডি

কার্জনের মন আগেভাগে জয় করার জন্য একটি রিয়া উপহার দেয়া ।

একদিন অপরাহ্নে বড়লাট সাহেবের ভবনে দেখা গেল মহিমকে, সঙ্গে বীরেন্দ্রকিশোর আর ব্রজেন্দ্রকিশোর । মহিমের জবরদস্ত চাপকান পোষাকের সঙ্গে কোমরবন্ধে শোভা পাচ্ছিল একটি রিয়া যা কিনা মহারাজা রাধাকিশোরের বড় ঈশ্বরী মহারাণী তুলসীবতী তাঁকে আদর করে দিয়েছিলেন। এত সুন্দর এবং অপূর্ব রিয়া সচরাচর দেখা যায় না । রিয়া যদিও ত্রিপুরার মেয়েদের বক্ষবন্ধনী, কিন্তু খুবই বাহারি বলে পুরুষেরাও কেউ কেউ রিয়াকে কোমরবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করেন । কোন কোন রাজপুরুষকে আবার মাথার পাগড়ি হিসেবেও রিয়াকে ব্যবহার করতে দেখা যায় ।

ভাইসরয় লর্ড কার্জনের সঙ্গে দেখা করার জন্য মহিম নবাব আব্দুল লতিফের কাছ থেকে একটা পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছিলেন । লর্ড কার্জন নবাব লতিফের চিঠিটি ভালো করে পড়লেন। তারপর চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুই নবীন কিশোর, এর মধ্যে একজন ত্রিপুরার প্রিন্স হতে চায় । দু'জনেই একরকম রাজপোষাক পরে এসেছে । দু'জনের মাথায় উষ্ণীষ ।

লর্ড কার্জন ভুল করে ছোট ভাই ব্রজেন্দ্রকিশোরের থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি প্রিন্স হতে চাও ।

হা হা করে ছুটে এসে মহিম বললেন, মি লর্ড, এই মহারাজকুমার নন । প্রিন্স হবেন ইনি, এঁর নাম বীরেন্দ্রকিশোর । আমাদের মহারাজা রাধাকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র । আমাদের ত্রিপুরার উত্তরাধিকার আইন হল, রাজার বড় ছেলে রাজা হবে । অন্য কেউ নয় । আপনি হয়তো জানেন না, আমাদের বড়ঠাকুর যিনি মহারাজার স্টেপ ব্রাদার তিনি সিংহাসন দাবী করে আলিপুরের কোর্টে এক মামলা দায়ের করেছেন। যেটা ঠিক উচিত হয়নি ।

কেন ? লর্ড কার্জন প্রশ্ন করলেন, মামলা করাটা উচিত হবে না কেন ? আইনই তো ঠিক করে দেবে কে রাজা হবে কে হবে না । তাই নয় কি ?

মহিম তখন আদালতের উকিলবাবুদের মত সওয়াল করে বললেন, মি লর্ড । ব্রিটিশ আইন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রযোজ্য । প্রকৃতপক্ষে, ত্রিপুরা ব্রিটিশ আইনের অধীন নয় । ত্রিপুরা একটি ছোট স্বাধীন রাজ্য । সেখানে ত্রিপুরার নিজস্ব আইন-মাফিকই সবকিছু নিষ্পত্তি হওয়া বিধেয় । আপনি যদি আমার ধৃষ্টতা মাপ করেন তবে বলব, বড়ঠাকুর সব জানেন এবং সব জেনেশুনেও তিনি লেডি ডাফরিনের পরামর্শে মহারাজার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছেন ।

লেডি ডাফরিনের কথা শুনে লর্ড কার্জন ভ্রূ কোঁচকালেন । বড়লাটের পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই তিনি শুনে যাচ্ছেন আগে সরকারী কাজকর্মে প্রায়শই নাকি লেডি ডাফরিন হস্তক্ষেপ করতেন । রাজ্য শাসন এবং পরিচালনের ব্যাপারে মোটেই লেডি ডাফরিনের হস্তক্ষেপ মেনে নেয়া যায় না । আর এটি অনধিকারচর্চাও । লর্ড কার্জন খুবই বিরক্ত হলেন । সুযোগ বুঝে মহিম লেডি ডাফরিনের সঙ্গে বড়ঠাকুরের নৈকট্যের কথাটা পাড়তে ভুললেন না ।

তাতে অচিরেই ফল ফলল । লর্ড কার্জন মহিমের যুক্তিগুলো মেনে নিলেন । (এক) ব্রিটিশ আদালতের ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিচার করার এক্তিয়ার নেই । (দুই) ত্রিপুরার মহারাজা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ।

লর্ড কার্জন মহিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কথাবার্তায় তোমাকে বিশেষ আইনজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে । তুমি কি য়ুনিভার্সিটি থেকে বি এল ডিগ্রীধারী ?

মহিম হেসে বললেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াও জীবনে মাড়াইনি । প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করে স্কুল ছেড়েছিলাম । তবে দেশীয় রাজ্যের প্রজা বলে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে সব লিটারেচার এবং দৈনিক ইংরেজী খবরের কাগজগুলো আমাকে রোজ দিনকার আহার যোগায় ।

লর্ড কার্জন মহিমের কথাবার্তার ঢং দেখে কুর্সি থেকে উঠে এসে মহিমের পেটে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা মারলেন । হাসতে হাসতে বললেন, ওল্ড বয় ! কথাবার্তায় তুমি খুব স্মার্ট দেখছি। বেশ ইন্টারেস্টিং । তোমার কোমরে ওটা কি ? দারুণ দেখতে তো ?

মহিম মনে মনে জিভ কাটলেন দাঁত দিয়ে । সবই হয়েছে, তবে ছোট্ট একটা কাজ এখনও বাকি আছে । নিজের কোমর থেকে রিয়াটা খুলে নিয়ে মহিম বললেন, এটি একটি রিয়া । আমাদের ত্রিপুরার সুন্দরীরা রিয়াকে বক্ষবন্ধনী বা ব্রেসিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে । লেডি কার্জনকে উপহার দেবার জন্য আমাদের মহারাজা রাধাকিশোর বলেছিলেন । আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা করবেন ।

লর্ড কার্জন রিয়াটাকে হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন । অপূর্ব সূক্ষ্ম কাজ একখণ্ড বস্ত্রে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না ।

রিয়াটাকে আবার মহিমের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে লর্ড কার্জন বললেন, আমি আগে এসেছি। এখনও লেডি আসেননি । কিছুদিন বাদেই লণ্ডন থেকে এসে পৌঁছুবেন । তিনি এলে তুমি নিজে এসে একদিন দিয়ে যেয়ো । তিনি এধরনের জিনিস পছন্দ করেন । ভিন্ন ভিন্ন দেশের ঐতিহ্যযুক্ত সামগ্রী সংগ্রহ করা তার বাতিক । শোনো, এগুলো তাঁর সখ বা হবি । তবে তিনি কখনই লেডি ডাফরিনের মত ভাইসরয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না ।

তিন

প্রতি বছর সাধারণত শীতের সময় মহারাজা রাধাকিশোর কলকাতায় আসেন। আসাটা মূলত আমোদপ্রমোদের জন্য । এবারও এসেছেন । এবার অবশ্য ফূর্তির চেয়ে বৈষয়িক কাজের চাপ বেশী। রাজ্যে নানারকমের অশান্তি চলছে । সমরেন্দ্র নিত্যদিন নূতন নূতন ঝামেলা পাকাচ্ছেন। তাছাড়া রাজপ্রাসাদের অলিন্দে চলছে ষড়যন্ত্রের ফিসফিসানি । ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছেন কেউ কেউ, যারা প্রকাশ্যে রাধাকিশোরের সুহৃদ আর আড়ালে তাঁর সর্বনাশ করার জন্য সতত সচেষ্ট।

রাজমন্ত্রীদের মধ্যে চলছে প্রকাশ্যে খেয়োখেয়ি । রাধাকিশোর যে এগুলো জানেন না তা নয়। কিন্তু জেনেও কিছু করতে পারছেন না । দিনদিন তিনি ষড়যন্ত্রী এবং চক্রান্তকারীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়ছেন । রাজ কোষাগারে অর্থাভাব ঘটলে বাধ্য হয়ে মহারাজা গভর্নমেন্টের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। ঋণের শর্তানুসারে চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীতে গভর্নমেন্টের লোককে ম্যানেজার পদে বহাল করতে হয়েছে মহারাজার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও। এখন রাজ্যের মন্ত্রীপদে যদি একজন সুযোগ্য সুদক্ষ প্রশাসককে না প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তবে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ চক্রান্তকারীদের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়বে বলে আশংকা অনেকেরই।

মহারাজা রাধাকিশোর নিজের দুঃসময়ে কলকাতায় এলে প্রথমেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের রবিবাবুর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেন । রবিবাবু মূলত কবি হলেও আগেও একাধিকবার সুপরামর্শ দিয়ে রাধাকিশোরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। রবিবাবু এমনিতে রাধাকিশোরের চেয়ে বয়সে চার পাঁচ বছরের ছোট । বয়সে ছোট হলে কি হবে, রবিবাবু ছিলেন রাধাকিশোরের বাবা মহারাজা বীরচন্দ্রের অসমবয়সী বন্ধু । প্রবীণ রাজা বীরচন্দ্র একজন নবীন কবির সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন কাব্যালোচনা করে সময়পাত করেছেন । পিতার সঙ্গে যে পরিচয় ছিল শ্রদ্ধার, এখন পুত্রের সঙ্গে সেই সম্পর্ক বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়েছে।

পরপর দু'তিনদিন রবিবাবু ছুটে এসেছেন মহারাজা রাধাকিশোরের সঙ্গে দেখা করতে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও । ব্যস্ততা অবশ্য মহারাজার জন্যই । আগামী ষোলই ডিসেম্বর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক নং রেণি পার্কের বাড়ীতে রাধাকিশোরের জন্য একটি সম্বর্ধনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে মহারাজার সম্মানার্থে ত্রিপুরার রাজপরিবারের আখ্যান নিয়ে রচিত 'বিসর্জন' নাটকটি অভিনীত হবে । তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল, রবিবাবু স্বয়ং রঘুপতির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন । রবিবাবু নাটকটির রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত । এজন্য শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করে কলকাতার পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়েছেন । সমস্ত অনুষ্ঠানটি ভারত সঙ্গীতসমাজের প্রযোজনায় রূপায়িত হবে । এজন্য বেশ কিছুকাল যাবৎ কবি কলকাতায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

সকালবেলায় মহারাজা তাঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের প্রাসাদের আঙ্গিনায় শীতের মরশুমী ফুলের বাগানে বসে রবিবাবুর জন্য প্রতীক্ষা করছেন । রবিবাবু এসেছেন, তাঁর খানিক দেরী হয়েছে আসতে । তিনি এখানে আসার আগে রমণীমোহনকে একেবারে তাঁর বাড়ী থেকে গিয়ে তুলে নিয়ে এসেছেন । রমণীমোহন হলেন রবিবাবুর দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই ।

রবিবাবু কোনরকম ভূমিকা না করেই বললেন, এই হল রমণীমোহন যার কথা আপনাকে আমি আগে বলেছিলাম । রমণী আমাদের জামাই। জামাই বলে বলছি না, রমণী একজন কৃতবিদ্য অ্যাটর্নি এবং কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে কাজ করে খুব সুনাম কুড়িয়েছে। রমণী একজন দক্ষ প্রশাসক, আপনি তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারেন । আমি যা আপনার কাছে

শুনলাম এবং অন্যান্য সূত্র থেকে যে সব সংবাদ আমি পেয়েছি তাতে আমার মনে হয়েছে, আপনার একজন সৎ, সুদক্ষ প্রশাসক দরকার। আমার তো মনে হয়, রমণীমোহন আপনার এই সময় খুবই কাজে আসবে। আপনি তাকে নির্দ্বিধায় আগরতলায় রাজমন্ত্রী করে নিয়ে যেতে পারেন। কিছুদিন কাজ করার পর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন রমণী কতটা কাজের। ভালো না লাগলে রমণী চলে আসবে। আবার ইচ্ছে করলে আপনি তার আগেই তাকে ছুটি দিয়ে দিতে পারেন, আমি তাতে কিছু মনে করব না।

রবিবাবু দীর্ঘক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে এবার থামলেন। রাধাকিশোর প্রসন্ন হয়ে বললেন, আমি জানতাম, আপনি আমাকে বিপদে উদ্ধার করবেন। আমার এও প্রত্যয় আছে আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার ও প্রকৃতির প্রতিকূলেও রক্ষা করবেন।

রবিবাবু স্বগতোক্তির মত বললেন, কেবল মহারাজকে নয়, আমার নিজেকে উদ্বেগ হতে মুক্ত করার জন্যও আমাকে মহারাজের কর্মে চিত্ত নিয়োগ করতে হবে। ত্রিপুরার ইতিহাসে আমার পিতামহ দ্বারকানাথের যে যোগ ছিল সে যোগ আমাকেও রক্ষা করতে হবে। বিধাতার এই অভিপ্রায়বশতই অকস্মাৎ স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র বিনা পরিচয়েই আমাকে ত্রিপুরার সঙ্গে আবদ্ধ করে গিয়েছেন।

আলোচনার মধ্যপথে যতি টেনে রবিবাবু বললেন, আমি এখন উঠি। আজ আপনি কিন্তু আসছেন ভারত সঙ্গীতসমাজের সম্বর্ধনা সভায়। সন্ধ্যা ছটায় আমরা সাগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

সম্বর্ধনার আয়োজন সম্পূর্ণ। 'বিসর্জন' নাটকের কুশীলবেরাও সেজেগুজে প্রস্তুত। সবাই অপেক্ষা করছেন অধীর হয়ে। মহারাজা রাধাকিশোর এখনও এসে পৌঁছোন নি, তাই শুরু করা যাচ্ছে না। নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ পাখোয়াজ সহযোগে একটি গান বারবার গেয়েই চলেছেন। গানটি হল ঃ

রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,
    ত্রিপুর-পুর লক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা,
গুণী-রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে
    তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণ- রস ঢালা।
দীন-জন দুখ হরণ নিপুণ তব পাণি,
ক্ষীণ-জন ভয়-তারণ অভয় তব বাণী,
    গুণ অরুণ কিরণে তব সব ভুবন আলা।

এ গানটি রবিবাবু মহারাজা রাধাকিশোরের সম্বর্ধনার জন্য বিশেষ করে লিখেছেন। কবি নিজেই তাতে সুরারোপ করেছেন। জগদীন্দ্রনাথ অনেক তালিম এবং কসরৎ করে গানটি গলায় তুলেছেন। বন্ধুবর রাধাকিশোরের সম্মানার্থে আজ তিনি গানটি গাইবেন বলে শুরু

থেকে উত্তেজিত। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি কিছুটা নিরুৎসাহিত। ফাইন্যাল রিহার্সাল হয়ে যাবার পরও তিনি গানটা আবার ঘুরেফিরে চাপা গলায় গাইছেন, কি আর করা। সময় তো কাটাতে হবে। একসময় সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ীর সামনে একটা ফিটন গাড়ি এসে থামল। উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে অনেকজন পড়িমরি করে ছুটে গেলেন। গাড়ী থেকে নামলেন মহারাজা রাধাকিশোরের পার্শ্বচর কর্ণেল মহিম ঠাকুর সঙ্গে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর। রাধাকিশোর আসেন নি। খবরটা রটে যেতে গ্রীনরুম থেকে ধরাচূড়া পরেই ছুটে এলেন রবিবাবু। রবিবাবু 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতি। তাঁকে রঘুপতির বেশভূষায় প্রিয়দর্শন সুকুমারতনু রবীন্দ্রনাথ বলে চেনা যাচ্ছে না। রঘুপতিবেশী রবিবাবুকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি রুক্ষ্ম এবং কঠিন। তাঁর কপালে ত্রিপুণ্ডক ও চন্দনের ফোঁটা, মাথায় কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ ললাটোর্ধ্বে চূড়াকারে সংবদ্ধ। রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্রে তাঁর দেহ বিমণ্ডিত। সে এক অপূর্ব অলৌকিক মূর্তি! আয়ত উজ্জ্বল চোখ, পুরুষালি সুকঠোর অনমনীয় দৃঢ়সংকল্প সিদ্ধির-লক্ষ্যে তেজোদীপ্ত।

মহিম ভীষণ কাঁচুমাচুভাবে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, মহারাজা আসতে পারেন আবার নাও পারেন। একটা অনিবার্য রাজকার্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মহারাজকুমারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন অনুষ্ঠান শুরু করে দিতে। মহারাজা তাঁর অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

সারাদিনের আনন্দ এবং উত্তেজনার মধ্যে যেন কেউ এক বালতি জল ঢেলে দিল। রাধাকিশোরকে বাদ দিয়ে এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হয় কি করে? এ যেন শিববিহীন শিবযজ্ঞ। এখন এমন সময় যে অনুষ্ঠান স্থগিত বা বাতিল করাও যায় না। কি এমন কাণ্ড ঘটল যে মহারাজা রাধাকিশোর তাঁর নিজের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আসতে পারছেন না? আজ সকালেই রবিবাবুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে। জামাই রমণীমোহন রাজমন্ত্রী হয়ে আগরতলায় যাবে, তার নিয়োগও পাকা।

রাধাকিশোরের আজকের নাটকানুষ্ঠানে না আসার কারণটা খুব একটা যে বড় কিছু তা নয়। আবার একেবারে ছোট বলেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। আগরতলা থেকে বিকেলবেলায় খবর এসেছে রাধাকিশোরের অবর্তমানে রাজধানীতে সমরেন্দ্র নূতন করে এক হীনকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। রাধাকিশোরকে জব্দ করার জন্য সমরেন্দ্র কোন কিছুরই আর বাকী রাখছেন না। নীলমণি দেবতার চরণে তুলসী দিয়েছেন, ওঝাকে দিয়ে মৃত্যুকামনা করে যাগযজ্ঞ তুকতাক করেছেন, আদালতে উত্তরাধিকার আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, এমনকি বড়লাটের স্ত্রী লেডি ডাফরিনের পদসেবার ছলে রিয়া উপহার দিয়েও দেখেছেন। কিছুতেই তাঁর প্রতি রাজলক্ষ্মী প্রসন্ন হন নি। এবার সমরেন্দ্র যা করতে নেমেছেন, এর চেয়ে নীচে আর নামা যায় না। আগরতলার খবর যা দূত মারফত মহারাজার কানে এসে পৌঁছেছে তা হল, দুজন অন্তঃসত্ত্বা রমণী, যারা আবার নিজেরা মা ও মেয়ে, তারা শহরের বিশিষ্ট অমাত্যদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সুবিচার চাইছে। তাদের গর্ভবতী হওয়ার কারণ নাকি স্বয়ং রাধাকিশোর। সমরেন্দ্র মরীয়া হয়ে উঠেছেন। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে শেষ পর্যন্ত ভাড়া করা বারবণিতাকে দিয়ে মহারাজার

চরিত্রহননে নেমেছেন সমরেন্দ্র । রাধাকিশোর স্বপ্নেও ভাবতে পারছেন না সমরেন্দ্র শেষ পর্যন্ত এত নীচে নামতে পারে ! এতই তাঁর মন খারাপ যে তিনি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আদৌ যেতে পারবেন কিনা, গিয়ে উপভোগ করতে সমর্থ হবেন কিনা ভেবে ঠিক করতে পারছেন না । তাই মহিমকে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন । আর ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চেয়েছেন উদ্যোক্তাদের নিকট, বিশেষ করে রবিবাবুর কাছে ।

রঘুপতির পোষাকে সজ্জিত রবিবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন । কিছুক্ষণ বাদে 'বিসর্জন' নাটক অভিনয়ের কথা । নিজের লেখা 'বিসর্জন' । পুরো নাটকটি তাঁর কণ্ঠস্থ । যদিও তিনি আজ রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করবেন, তবু মহিমের কাছে মহারাজা রাধাকিশোরের না আসার কারণটি শুনে বিড়বিড় করে নাটকের একটি সংলাপ আবৃত্তি করলেন । রঘুপতির নয়, গোবিন্দমাণিক্যের । নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রাসাদকক্ষে রাণী গুণবতী প্রবেশ করছেন, তখনকার গোবিন্দমাণিক্যের মুখে যে সংলাপ তা রবিবাবু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন —

.... প্রিয়ে, বড়ো শুষ্ক,
বড়ো শূন্য এ সংসার । অন্তরে বাহিরে
শত্রু । তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালোবেসে চাও মুখপানে ।....

এমন সময় বাড়ীটির সামনের রাস্তায় কোলাহল শোনা গেল । রাধাকিশোর এসেছেন। মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা কেটে গিয়ে সেখানে উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ল । হুড়োহুড়ি করে যে যার জায়গায় এবং যার যা ভূমিকায় যা কিছু করার জন্য ছুটে চলে গেলেন। নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তে কিছুটা সময় পরে অনুষ্ঠান শুরু হলেও কিছুই কাটছাঁট করা হল না। সবই হল নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে । প্রথমে মহারাজ জগদীন্দ্র প্রাণ ঢেলে আবেগমথিত গলায় 'রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা' উদ্বোধনী সংগীতটি গাইলেন। গানটি শুনে রাধাকিশোর খুবই অভিভূত হয়ে পড়েন । এরপর মহারাজা নিজে যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে সুযোগ্য ভাব ও ভাষায় সংগীত সমাজের অভিনন্দনের উত্তরে প্রত্যাভিবাদন জানালেন। তারপর রাধাকিশোরের সম্বর্ধনার অঙ্গ হিসেবে 'বিসর্জন' নাটকটির অভিনয় শুরু হল । রঙ্গমঞ্চের পর্দা সরাতে দৃষ্টিগোচর হল সিনে আঁকা ত্রিপুরার পাহাড়ী প্রেক্ষাপট — ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের শীর্ষ। নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে রাণী গুণবতীকে দেখা গেল ।

গুণবতী। মার কাছে কি করেছি দোষ ! ভিখারি যে,
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
তারে দাও শিশু — পাপিষ্ঠা যে, লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব ।...

মহারাজা রাধাকিশোরের মন ভাসতে ভাসতে চলে যায় তাঁর নিজের রাজ্য ত্রিপুরায়।

তারপর সে মন ফিরে যায় সুদূর অতীতে । গোবিন্দমাণিক্য, গুণবতী, এঁরা রাধাকিশোরের পূর্ব পুরুষ । এঁদের রক্তের ধারা বইছে রাধাকিশোরের মধ্যেও । ঈশ্বরের সৃষ্টি এই পৃথিবী দুর্জ্ঞেয় এবং রহস্যে ভরা । সেই সুদূর অতীতে গোবিন্দমাণিক্যের বেলায় যে প্রেম হিংসা প্রতাপ এবং সংস্কার সত্যি ছিল, আজও, এতদিন পরেও মনে হয় সেগুলো সমান সত্যি।

কালের প্রবাহে বহিরঙ্গে কিছুটা বদলেছে বটে, তবে ভেতরে ভেতরে কিছুই বদলায়নি। বলির নামে এখন আর বাইরে রক্তপাত হয় না বটে । তবে অন্তরে অন্তহীন লালসা কামনা বাসনার বিরামহীন রক্তপাত হয়ে চলছে । রাধাকিশোর একাধিকবার রবিবাবুর 'বিসর্জন' পড়েছেন, কিন্তু স্বচক্ষে 'বিসর্জন' দেখে তার মন প্রাণ ভরে যাচ্ছে।

পড়া এক জিনিস আর চোখের সামনে দেখা অন্য জিনিস । নাটকের কুশীলবেরা দুর্দান্ত অভিনয় করছে । নাটক চলাকালীন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল । 'বিসর্জন'-এর তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের একেবারে শেষের সময় রঘুপতির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে রবিবাবু এক রোমহর্ষক ঘটনা বাধিয়ে বসলেন । রাত্রি শেষ হয়ে আসছে । নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । ধ্রুবকে মায়ের পদতলে বলি দেয়া হবে এবার । এসময় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। রঘুপতি তড়িঘড়ি বলে উঠলেন— 'সংবাদ পেয়েছে রাজা। আর তবে এক পল দেরী নয়, জয় মহাকালী' বলেই ধ্রুবকে হত্যা করতে খড়্গ উত্তোলন করলেন। গোবিন্দমাণিক্যের প্রহরী সব মঞ্চে প্রবেশের আগেই রঘুপতি বালক ধ্রুবের ঘাড়ে বসিয়ে দিতে গেলেন এক কোপ । খড়্গটি যে তীক্ষ্ণধার ছিল, রঘুপতি ওরফে রবিবাবু ভুলে গিয়েছিলেন। অভিনয়ে এতই মগ্ন ও বিভোর হয়ে পড়েছিলেন রবিবাবু, স্টেজের অন্যান্য অভিনেতারা তাড়াতাড়ি ধ্রুবকে খাঁড়ার নাগালের বাইরে ঠেলে সরিয়ে দেন, নইলে একটা বড় বিপদই হত তখন । ঘটনায় দর্শকেরা বিমূঢ় হয়ে যায়। অনেকেই আসন ছেড়ে চঞ্চল হয়ে উঠে পড়েন। ঘটনার আকস্মিকতাকে সামলানোর জন্য রঙ্গমঞ্চের পর্দা অনির্দিষ্ট সময়ে টেনে নামিয়ে দেয়া হয় । অনেকক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হয় অভিনয়। চঞ্চলতা প্রশমিত হলে তারপর আবার অভিনয় শুরু হয় ।

দর্শকদের চিত্ত জয় করে মুহুর্মুহু করতালির মধ্য দিয়ে 'বিসর্জন' নাটকটির অভিনয় একসময় শেষ হয়। নাটকের যবনিকাপাতের পর অভিনেতা কুশীলব প্রত্যেকের সঙ্গে মহারাজা রাধাকিশোরের পরিচয়পর্বের সময় তিনি স্টেজে গিয়ে একে একে করমর্দন করেন । ধ্রুবের ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল সে ছেলেটির নাম অশ্বিনী । অশ্বিনীকে কাছে ডেকে আদর করে রাধাকিশোর তার ঘাড়ে হাত রেখে দেখলেন সত্যি কোন কোপের দাগ পড়েছে কি না ।

রবিবাবু তখনও রঘুপতির বেশভূষা ধরাচূড়া পড়ে আছেন। তিনি খুব লজ্জিত এবং সংকুচিত বোধ করছিলেন। ম্রিয়মান গলায় রবিবাবু বললেন, রঘুপতির অভিনয় করতে করতে আমার যে কি হয়ে গেল । আমি সব ভুলে গেলাম, একজন অভিনেতার এমন হওয়া উচিৎ হয় নি। মহারাজ, 'বিসর্জন' নাটকটি আবার আমরা ধীরেসুস্থে অভিনয় করব, আপনি সেবার অবশ্যই

আসবেন। তখন আমি হব জয়সিংহ।

রাধাকিশোর একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, রবিবাবু আপনি কবি। আপনি নাট্যকার। আপনি অভিনেতা। আপনি ইচ্ছে করলে রঘুপতি হতে পারেন, আপনি ইচ্ছে করলে জয়সিংহ হতে পারেন। আপনি চাইলে হতে পারেন গোবিন্দমাণিক্যও।

কিছুক্ষণ কথা না বলে চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর পুরোনো প্রসঙ্গ টেনে উদাস হয়ে রাধাকিশোর বললেন, অথচ আমার কথা ভাবুন। একবার জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমি যে রাধাকিশোর মাণিক্য হয়ে গিয়েছি আর অন্য কিছু আমি হতে পারি না। আপনার 'বিসর্জন' নাটকের ভাষায় গোবিন্দমাণিক্যের মত বলতে ইচ্ছে করে —

ভাই বন্ধু কেহ নাই মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি।

'বিসর্জন' নাটকের বাইরে যেন আর এক নাটক অভিনীত হচ্ছে। আশেপাশের সবাই উদগ্রীব হয়ে অশেষ কৌতূহল নিয়ে দেখছে।

রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথের করতলে নিজের হাত রেখে বললেন, আজ চলি, রবিবাবু। আপনার সঙ্গে এবার প্রাণ খুলে গল্প করা গেল না। কেন না কাল সকালেই আমি আগরতলা চলে যাচ্ছি। মনটা ভালো নেই আমার। কিছুদিন বাদে সব সামলে গুছিয়ে-টুছিয়ে আসব। সেবার যাব দার্জিলিং। আপনিও আসুন। আপনার কবিতার খাতা ও দু'একখানা বই সঙ্গে নেবেন। হিমালয়ের মহান সৌন্দর্যের সঙ্গে আপনার কবিতা ও সঙ্গীত সংযোগে আমার অবসরকালের বিশ্রাম কত যে মধুময় হবে, সে কথা ভেবে এখনই উৎসাহ এবং রোমাঞ্চবোধ করছি।

চার

দার্জিলিংয়ে 'আনান্দেল হাউসে' কবি উঠেছেন। সেখানে আনন্দমোহন বসুর মেয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন তিনি। কথামত রাধাকিশোরও এসেছেন দার্জিলিংয়ে। সময় বৈশাখের শেষাশেষি। গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে অনেক দূরে শীতার্ত দার্জিলিং এই সময় অবসর কাটানোর জন্য এক আদর্শ জায়গা। এই সময়ে কলকাতা থেকে অনেকে এখানে পালিয়ে আসেন।

বাংলার লেফটেনেন্ট জেনারেল উডবার্ণ সাহেবও এখন আছেন এখানে। কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণও আগে থেকে এসে হাজির। কলকাতার বহু ইংরেজ-ভাবাপন্ন অভিজাত ব্যক্তিগণের ভীড়ে দার্জিলিং গমগম করছে। নিরিবিলি বলে কিছু ব্যাপার আর নেই এখানে। রবিবাবুর সঙ্গে রাধাকিশোরের বারকয়েক দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে ইতিমধ্যে। সাক্ষাৎকারগুলো সবই নিরস কাজের কথায় বিনষ্ট হয়েছে। কাব্য সুধারস পান করার জন্য একান্ত করে সময় সুযোগ পাওয়া যায়নি। কবির মধ্যস্থতায় কোচবিহারের মহারাজের সঙ্গে রাধাকিশোরের দীর্ঘ আলোচনা হল। বিষয়বস্তু দেশীয় রাজাদের অধিকার এবং কর্তব্য। ব্রিটিশ রাজের কাছে তাঁদের

মর্যাদা যেন কোনভাবেই খর্ব না হয়, তার জন্য ভারতীয় রাজন্যবর্গের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দু'জন নৃপতির অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। কাজের কাজ কতটা কি হবে কে জানে। মহারাজকুমারদের প্রাইভেট টিউটর স্বদেশী হবেন না বিদেশী হবেন এ বিতর্ক নিয়ে কেটে গেল কয়েকটা সকাল।

একদিন রবিবাবুর ঠাণ্ডা লাগল জ্বর। প্রায় ডাবল নিমোনিয়া। তাছাড়া তাঁর বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ের পাকা কথাবার্তা চলছিল। রবিবাবু অসুস্থতার কারণে এবং মেয়ের বিয়ের অজুহাতে হঠাৎই কুষ্টিয়ায় চলে গেলেন। রাধাকিশোরের দার্জিলিং আসাটা বস্তুতই নিস্ফলা হল। কতগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয় ছিল যেগুলো রবিবাবুর সঙ্গে একান্তে আলোচনাই করা গেল না। রবিবাবুর পরামর্শ ভীষণ দরকার ছিল তাঁর।

আগরতলায় মহারাজা ফিরে এসে দেখলেন সমরেন্দ্র আরও বেপরোয়া হয়েছেন, আরও দুর্বিনীত। রাধাকিশোরের সিদ্ধান্তহীনতাকে সমরেন্দ্র দুর্বলতা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কলকাতার অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সমরেন্দ্রর যোগাযোগ ছিল। তাঁরা তাঁর পক্ষ হয়ে রাধাকিশোরের কর্তৃত্বকে খাটো করে সর্বত্র দেখাতে লাগলেন। বহুল প্রচারিত এবং প্রভাবশালী পত্রিকা 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় সমরেন্দ্রকে সমর্থন করে এবং রাধাকিশোরের আদ্যশ্রাদ্ধ করে একাধিক সম্পাদকীয় বের হতে লাগল। এ হল কলকাতার খবর। আর এদিকে আগরতলায়ও রাধাকিশোরের শত্রুরা সহস্র ফণা তুলে দংশনের অপেক্ষায় কাল গুনছে। রাধাকিশোর কি করবেন এখন? চারদিকে স্বার্থান্বেষী মতলববাজ লোকে ছেয়ে গিয়েছে। কাকে যে তিনি বিশ্বাস করবেন, কাকে যে বিশ্বাস করবেন না, সেটাই তিনি বুঝতে পারছেন না। রবিবাবুকে এখন কাছে পেলে ভালো হত। কেন যেন মনে হয় তাঁকে সব খুলে বলা যায় এবং তাঁর ওপরই পুরো নির্ভর করা যায়।

রাধাকিশোর তাঁর এরকম ঘোরতর দুঃসময়েও নিজের মনে একাকী হেসে ফেলেন। এ এক অদ্ভুত কান্ড। একজন কবি, যিনি কবিতা লেখেন, তিনি তো ভাবের জগতে থাকেন। সংসারের কূটকচালির ঊর্ধ্বে তিনি। তিনি কি করে জানবেন, অংকুশ ক্ষুদ্র হলেও কতটা নিষ্ঠুরের মত বিদ্ধ করে হৃদয়কে। তাছাড়া একজন কবির জানার কথা নয়, আক্রান্ত এবং পরাস্ত হবার আগেই কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়। এসব রণকৌশল একজন রাজারই ভালো করে জানার কথা, একজন কবির নয়। অথচ কবি হয়েও রবিবাবু এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

আগরতলার রাজপ্রাসাদে এত লোক এত অমাত্য পরিবৃত হয়েও রাধাকিশোর নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ এবং একাকী বোধ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে বৈকল্য ও বিষণ্ণতা তাঁকে গ্রাস করতে লাগল। যতদিন যাচ্ছে, ততই যেন মহারাজা রাধাকিশোরের কর্তৃত্ব ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ছে। ইদানীং তাঁর রাজকার্যে আগ্রহ কম বলে মনে হচ্ছে।

একদিন মধ্যাহ্নে রাজদরবার চলাকালীন হঠাৎই উজির গোপীকৃষ্ণকে বললেন, গোপী তোমার কবিতা কেমন লাগে? বিশেষ করে রবিঠাকুরের কবিতা ?

গোপীকৃষ্ণ থতমত খেয়ে যান। রাজদরবার হল এমন স্থান যেখানে সবই সিরিয়াস ব্যাপার

নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেখানে কবিতার কথা আসে কি করে ? গোপীকৃষ্ণ হলেন রাধাকিশোরের ছোট বোন অনঙ্গমোহিনীর স্বামী। অনঙ্গমোহিনী কবিতা টবিতা লেখেন। গোপীকৃষ্ণও কবিতা মক্সো করেন কিনা লুকিয়ে কে জানে। তাছাড়া, গোপীকৃষ্ণ উজির হলেও তিনি সম্পর্কে মহারাজার ভগ্নিপতি। শালা ভগ্নিপতির মধ্যে ইয়ার্কি ঠাট্টা অস্বাভাবিক নয়। তবে গোপীকৃষ্ণ ভীষণ অবাক হয়েছেন এই দরবার চলাকালীন কবিতার মত লঘু বিষয়বস্তুর অবতারণা নিয়ে। রাধাকিশোর জ্যেষ্ঠ শ্যালক হলেও তিনি মহারাজা। তাঁর মর্জি হলে তিনি যা খুশী তা নিয়ে দরবারের অমাত্য জনকে প্রশ্ন করতেই পারেন।

কি হল, কিছু বলছ না কেন? অধৈর্য্য হয়ে রাধাকিশোর বললেন, রবিবাবুর 'ন্যায়দন্ড' কবিতাটি পড়েছ?

উজির গোপীকৃষ্ণ ঢোক গিলে বললেন, আজ্ঞে না। পড়া হয় নি।

পড়ো । পড়ে দেখো, সুবিচার কি আর সুবিচার কাকে বলে? তোমাদের মত নীরস লোকদের ধারণা, কবিতা হল ফুল-পাখী-প্রেমের কথা শুধু, জীবনের দীনতা হীনতা ভ্রষ্টাচার এবং তার থেকে নিষ্কৃতির কথা নেই সেখানে। তা ঠিক নয়। রাধাকিশোর সিংহাসন থেকে উঠে এসে দীর্ঘ ছায়া পশ্চাতে ফেলে রেখে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আবেগমথিত গলায় রবিবাবুর 'ন্যায়দন্ড' কবিতাটির শেষাংশটি মন থেকে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন ঃ

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।।

দরবারের সবাই বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। ত্রিপুরার রাজদরবারে এরকম দৃশ্য আগে কেউ দেখেনি। আর্জি বিচার বন্ধ রেখে কবিতাপাঠ, সেও মহারাজা স্বয়ং কবিতা আবৃত্তি করছেন, এ এক বিরল ঘটনা।

রাধাকিশোর আবৃত্তির শেষে অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, আজকের মত দরবার এখানেই শেষ। তোমারা বাড়ী যাও। আর শোনো, দরবারে আজ মহিমকে দেখছি না। মহিমকে খবর পাঠাও। বলো, আমি বলেছি রাজবাড়ীতে সামনের দোল পূর্ণিমায় রবিবাবুর 'বিসর্জন' নাটকটির অভিনয় হবে। এখনও অনেক সময় আছে। মহিম যেন রিহার্সালের ব্যবস্থা করে। আমি হবো গোবিন্দ মাণিক্য।

সবাই চলে গেলে রাধাকিশোর ইশারায় উজির গোপীকৃষ্ণকে কাছে ডেকে নিলেন। কাঁধে

হাতে রেখে বললেন, আমার ভাই সমরেন্দ্র এখন কোথায়? তাঁকে বলো এক সময় নিভৃতে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়।

উজির গোপীকৃষ্ণ দীর্ঘদিন ধরে রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত। শ্বশুর মশাই মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলেও তিনি দরবারের কার্যবিবরণীতে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে কোনদিন আজকের মত অদ্ভুত কান্ড ঘটেনি আগে। মহারাজা রাধাকিশোরের ব্যবহার ইদানীং খুবই দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছে। আসলে ঘরে বাইরে এত চাপ, মনে হয়, তাতে রাধাকিশোর ভেতরে ভেতরে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন।

কয়েকদিনের মধ্যে পরপর দুটি রাজ অধ্যাদেশ বা রোবকারি জারী হল। তাতে আগরতলার অমাত্য এবং নাগরিকেরা ও কলকাতায় রাধাকিশোরের শত্রুমিত্রেরা বিচলিত হলেন। অবশ্য পরে সবই আবার স্তিমিত হয়ে এল। এক নম্বর অধ্যাদেশটি হল ঃ

রাজ্য হইতে বহিষ্কারের আদেশ

শ্রীহরি

R K. Debbarman

মেমো নং ২

নানা কারণে এইক্ষণ শ্রীমান সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণের এ রাজ্যে বাস করা সঙ্গত নহে। অতএব আদেশ করা যায় যে উক্ত শ্রীমান আগামী একুশে আষাঢ় মঙ্গলবারের মধ্যে এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যায়। স্থানান্তরে গিয়া জানাইলে তাহার খরচাদির জন্য মাসিক অনধিক এক হাজার টাকা করিয়া তাহাকে দেওয়া যাইবে। অবগতি ও আচরণের নিমিত্ত এই আদেশের প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত উজির ও মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩১৪ ত্রিং তারিখ এগারই আষাঢ়।

এই অধ্যাদেশটি জারী হবার পাঁচদিনের মাথায় আর একটি রোবকারী প্রচারিত হয়। সেটি হল —

হুদ্দা বা উপাধি বাতিলক

শ্রীহরি

R. K. Manikya

রোবকারি দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা ইতি সন ১৩১৪ ত্রিং তারিখ ১৬ই আষাঢ়।

যেহেতু নানা কারণে শ্রীমান সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণের বড়ঠাকুরী হুদ্দা রহিতযোগ্য হইয়াছে অতএব

আদেশ—

উক্ত শ্রীমানের উল্লিখিত হুদ্দা রহিত করা যায়। অবগতার্থে ইহার প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত উজীর এবং শ্রীযুক্ত মন্ত্রীর নিকটে প্রেরণা করা যায়। —ইতি

রাজদরবারের অমাত্য সবাই অধ্যাদেশ দু'টি দেখে খুবই অবাক এবং বিহ্বল হয়ে পড়লেন। মহারাজা রাধাকিশোর প্রয়োজনে কঠিন কঠোর হতে পারেন, একথা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বিশেষ করে সমরেন্দ্রর প্রতি রাধাকিশোরের অতিরিক্ত স্নেহের কথা কারোর অজানা নয়। একটার পর একটা ছলচাতুরী দুষ্কর্ম করে গিয়েছেন সমরেন্দ্র । রাধাকিশোর কখনও টু শব্দটি করেননি। বরং উল্টো, সমরেন্দ্রর বিরুদ্ধে যারা বলেছে তাদের উপর তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছেন। অথচ একই রাধাকিশোর সমরেন্দ্রর 'বড়ঠাকুরী' হুদ্দা কেড়ে নিয়েছেন এবং তাঁকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবার আদেশ দিয়েছেন। এই মনের জোর তিনি পেলেন কোত্থেকে? কে তাঁকে শলাপরামর্শ দিচ্ছে অমাত্যরা তা জানতেই পারেন নি। সবাই নিজেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। অনেকদিন ধরে মহারাজা কলকাতা যাচ্ছেন না। কলকাতার রবিবাবু চিঠিতে বা সাক্ষাতে রাধাকিশোরকে এসব অপ্রিয় এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছেন তাও মনে হয় না। তবে রহস্যের উৎসটা কি জানতে সবাই হয়রান হয়ে পড়ছেন।

দীর্ঘদিন বাদে রাধাকিশোর অবসন্নতা এবং বিষাদকে কাটিয়ে উঠেছেন বলে মনে হয় । 'বিসর্জন' নাটকে গোবিন্দমাণিক্যর নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে তিনি তাঁর পার্ট মুখস্থ করে ফেলছেন । রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে বিরাট বেলজিয়াম আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নিজের অভিনয় নিজেই শুধরে আরও নির্ভুল এবং ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করছেন। গোবিন্দমাণিক্যের প্রেম প্রতাপ এবং অসহায়ত্বের সঙ্গে রাধাকিশোর একবারে একাকার হয়ে যান। তিনি যে মহারাজা রাধাকিশোর, তাঁরই পূর্বপুরুষ গোবিন্দমাণিক্য নন, সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পড়েছেন।

গোবিন্দমাণিক্যের ভাষায় রাধাকিশোর বলেন,

স্থির হও সবে ।
ভাই বন্ধু কেহ নাই মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্র রায়
অষ্টবর্ষ নির্বাসন করিবে যাপন।

প্রহরীগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত। রাজার সিংহাসন হইতে অবরোহণ

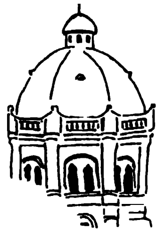
দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন। ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার। আজ হতে রাজগৃহ
সূচিকন্টকিত হয়ে বিঁধিবে আমায়।
রহিল তোমার সাথে আশীর্বাদ মোর;

যতদিন দূরে র'বি রাখিবেন তোরে
দেবগণ।　　　　[নক্ষত্রের প্রস্থান

সভাসদ্‌গণের প্রতি

সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে,
ক্ষণেক একেলা রব আমি।　　[সকলেব প্রস্থান

রাধাকিশোর সহসা গোবিন্দমাণিক্য থেকে আবার রাধাকিশোরে ফিরে আসেন। নক্ষত্র রায় এবং সমরেন্দ্র দু'জনের মধ্যে বিভাজন অস্পষ্ট হয়ে আসে।



খুঁজো না জীবনচরিতে

এক

অপরাধ খুব গুরুতর নয়, আবার গুরুতরও। আজ পর্যন্ত রাজধানী আগরতলায় কেউ এত বড় দুঃসাহস দেখায়নি— সেদিক দিয়ে হরেন্দ্র ময়রার সাহসের বলিহারি। এ কথা কে না জানে যে, নগরবাসীর কারোর বাড়ি কোন অবস্থায়ই রাজপ্রাসাদের চেয়ে উঁচু হতে পারবে না। এ কথা কি বলে দিতে হয় বা বলার দরকার আছে! বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর এসেছে এবং খোঁজ তালাস করে তাতে সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে, হরেন্দ্র ময়রা ঘোষ পট্টিতে তার দোকানের লাগোয়া বসতবাড়ীটিকে একতলা থেকে দোতলা বানাবার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে, বাড়ীটি দোতলা হলে রাজবাড়ীর চেয়েও উঁচু হয়ে যাবে— যদিও রাজবাড়ী থেকে এটি বেশ দূরে। বিষয়টি বেশ জটিল— কেননা এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে মহারাজার মানসম্মান এবং রাজা প্রজার মধ্যে পালনযোগ্য ব্যবধান । যা ঘোষণা করে মহারাজার নিরঙ্কুশ অধিকার সবকিছুর ঊর্ধ্বে। বিচারকরা হরেন্দ্র ময়রার ধৃষ্টতার বিচার নিজেরা না করে তাই সরাসরি মহারাজার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মহারাজা রাধাকিশোর স্বয়ং যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন এতে বিচারকরা অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবেন। গত পাঁচদিন ধরে হরেন্দ্র ময়রা রোজ একবার করে রাজদরবারে বলির পাঁঠার মত আসছে, সারাক্ষণ বুক ঢিবঢিব করে অপেক্ষা করছে। তারপর চলে যাচ্ছে। অনেক বিষয়-আশয় বা অপরাধের বিচার এবং হেস্তনেস্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হরেন্দ্র ময়রার বিষয়টি আর মহারাজার সমীপে সোপর্দ করা হচ্ছে না।

আজকে প্রায় দরবার শেষ হবার মুখে। হরেন্দ্র ময়রা নতমুখে পেছনের সারিতে বসে উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে। রোজদিন হাজিরা দিতে দিতে আর ভাল লাগছে না। এখানে এসে সকাল থেকে ধর্না দিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে, অন্যদিকে মিষ্টির দোকানের ব্যবসা পটল উঠল বলে। মালিকের অনুপস্থিতিতে কর্মচারীরা নিজেরাই রসগোল্লা পান্তুয়া সেঁটে সেঁটে দোকান ফাঁকা করে দিচ্ছে। কি কুক্ষণে যে একতলা বাড়ীটা দোতলা করার ব্যাপারটা মাথায় এসেছিল হরেন্দ্র ময়রার। হরেন্দ্র ময়রা নিশ্চিত জানে, দোতলা কেন আরও উঁচু বানালেও তা রাজবাড়ীর চেয়ে নীচুই থাকবে । কেননা রাজাদের একতলা আর গরীবদের একতলা উচ্চতায় এক নয়।

অবশ্য কার আছে এমন বুকের পাটা যে মহারাজাকে মুখের ওপর একথা বলবে। তার চেয়ে বরং ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা এখন হরেন্দ্র ময়রার।

খাস্ আদালতে যখন আপিল পর্ব চলছে, তখনই ডাকে একটা চিঠি এল কলকাতা থেকে। লিখেছেন জোড়াসাঁকো থেকে রবিবাবু। বিচারপর্ব থেমে রইল। মহারাজা রাধাকিশোর আগ্রহ সহকারে চিঠিটি পড়লেন। রবিবাবুর বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ে। বিয়ের ব্যাপারটা মহারাজার জানা। কিছুদিন আগে তিনি যখন দার্জিলিং ছিলেন সেখানে রবিবাবুও গিয়েছিলেন। আগে থেকে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে বইপত্র নিয়ে গিয়েও দার্জিলিং ভ্রমণটা জমেনি। মাধুরীলতার বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে রবিবাবু বিনা নোটিশে দার্জিলিং ছেড়ে চলে আসেন। বড় মেয়ের বিয়ে নিয়ে রবিবাবুর চিন্তার শেষ ছিল না। দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের বন্ধু কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে শরতের সঙ্গে বিয়ের ঘটকালি চলছিল। সবই ঠিকঠাক, শুধু যৌতুকাদি নিয়ে মতৈক্যে পৌঁছুতে পারা যাচ্ছিল না বলে বিয়েটা আটকে ছিল। রবিবাবু বিয়েতে পণ বা যৌতুকের ঘোরতর বিরোধী হলেও নিজের মেয়ের বিয়েতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে পণ দিতে প্রস্তুত। মানুষের জীবনে এটি একটি পরিহাস বটে। কোন কিছু না চাইলেও, মন থেকে ভালো না লাগলেও শুধু প্রিয়জনের মঙ্গল বা কল্যাণ হবে এই ভেবে অনেক কিছু মেনে নিতে মানুষকে বাধ্য হতে হয়। অনেকক্ষেত্রে আদর্শই বড় কথা নয় — সংসারের বৃহত্তর শান্তি এবং সুখের প্রশ্নে অনেক অন্যায় ব্যাপার স্যাপার মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

বিহারীলাল চক্রবর্তী কবি মানুষ, খুবই সাদাসিধে গোবেচারা। শরৎও ভালো ছেলে। সবই ভালো, তবু বিয়েতে প্রায় বিশ হাজার টাকা নগদ যৌতুক হিসেবে দিতে হবে, নইলে বিয়েটা হবে না। রবিবাবুর জামাই হিসেবে শরৎকে পছন্দ কিন্তু নগদ যৌতুকের ব্যাপারটা কিছুতেই তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। বাড়ির প্রথম বড় মেয়ের বিয়ে, শুধুমাত্র টাকার প্রশ্নে বিয়েটা ভেঙে গেলে মেয়ের মুখের দিকে আর তাকাতে পারবেন না তিনি। দার্জিলিংয়ে রাধাকিশোরের কাছে রবিবাবু সবকিছু খুলে বলেছেন। তারপর হঠাৎ বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে রবিবাবু দার্জিলিং ছেড়ে মাধুরীলতার বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে চলে এসেছেন। রবিবাবুর চিঠি অনুসারে মাধুরীলতার বিয়ে পয়লা আষাঢ় শনিবার। চিঠিটা পড়েই রাধাকিশোর স্থির করলেন, তিনি এ বিয়েতে যাবেন না। তাঁর না যাওয়াটাই হবে সব দিক থেকে সমীচীন। যদিও তিনি জানেন রবিবাবুর বড় মেয়ের বিয়েতে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত থাকতে পারবেন না। কেন না এক্ষুণি জগদীশ চন্দ্র বসু বিলেতে, লোকেনও সেখানে। নাটোরের রাজা জগদীন্দ্র নীলগিরিতে। এমতাবস্থায় রাধাকিশোর বিয়েতে উপস্থিত থাকলে রবিবাবু যারপরনাই খুশী হবেন। অথচ, শত ইচ্ছে থাকলেও রাধাকিশোরের একান্ত নিকট বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে যাবার উপায় নেই। সংসার এত অদ্ভুত জায়গা। এখানে যা করতে ইচ্ছে হয়, তা করা যায় না। আবার তাই করতে হয়, যা করতে ইচ্ছে হয় না।

রবিবাবুর চিঠিটা পড়ে রাধাকিশোরের মনটা বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল। তিনি রাজদরবারে উপস্থিত নাজির উজির অর্থীপ্রার্থী সবার দিকে কটকট করে তাকালেন। এই লোকগুলো হল

পাজির পা ঝাড়া। নিজেরা সব স্বার্থান্বেষী, ধান্দাবাজ। অথচ এরা অন্যের সব দোষ ত্রুটি ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ায়। এরা দুর্মুখ, এরা করতে পারে না এ হেন কর্ম নেই। এমনিতে দেখলে মনে হবে এরা ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। এরা মহারাজা যা বলেন তাতেই হ্যাঁ হ্যাঁ পার্টি। এরা সর্বনাশ করে ফেলবে যার, সে টেরটিও পাবে না। মহারাজা রাধাকিশোরের রবিবাবুর মেয়ের বিয়েতে সশরীরে যাওয়ার খুব ইচ্ছে। বন্ধুর জীবনের একটি অতীব শুভক্ষণে তাঁর পাশে থাকতে পারলে নিজেকে তিনি ধন্য মনে করতেন। কিন্তু তা হবার নয়। দরবারের এই শ্যেনচক্ষু লোকগুলোর ভয়ে তিনি যেতে চেয়েও যেতে পারবেন না। তিনি মহারাজা। মহারাজা হলে কি হয়— মহারাজাও যে কত অসহায় একথা বুঝিয়ে বলার নয়। মহারাজা রাধাকিশোর চিঠিটা হাতে নিয়ে ডাকলেন, মহিম।

মহিম দৌড়ে এসে বললেন, আজ্ঞে।

শনিবার দিন রবিবাবুর মেয়ের বিয়ে। রাধাকিশোর খানিকটা উচ্চস্বরে কথাটা বলে দরবারে উপস্থিত সবার দিকে একে একে তাকালেন। বললেন, বিয়েতে আমি যাব না। তুই যাস। বলবি, বড় ঈশ্বরী অসুস্থ, চিকিৎসা চলছে। তাই আমার যাওয়া হল না।

হঠাৎ মহারাজা সিংহাসন থেকে দরবার অসমাপ্ত রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আজকের কাজকর্ম এখানেই শেষ। তোমরা সব বাড়ী যাও। কাল এসো।

দরবারগৃহ থেকে অন্দরমহল যাবার পথে হরেন্দ্র ময়রা হাঁটু গেড়ে বসেছিল। রাধাকিশোর থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, তোর আবার কি?

মহিম চটপট সংক্ষেপে হরেন্দ্র ময়রার দোতলা বানানোর ধৃষ্টতার কথা বলতেই মহারাজা হেসে বললেন, তুই তো তাহলে গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছিস?

কাঁদতে কাঁদতে হরেন্দ্র ময়রা বলল, মহারাজ, আমি ক্ষমারও অযোগ্য। না জেনে অপরাধ করে ফেলেছি। আমাকে মাপ করে দিন, মহারাজ।

রাধাকিশোর কৌতুক অনুভব করলেন। বললেন, শোন! দোতলা বা রাজপ্রাসাদের চেয়ে উঁচু বাড়ি বানালেও আমি রাগ করব না। তবে একটা শর্তে, তোকে প্রমাণ করতে হবে যে তুই আরও পাঁচজনের চেয়ে ভিন্ন। ভিন্ন মানে তুই এমন কিছু পারিস যা অন্যেরা পারে না। তুই এমন কোন বিদ্যা জানিস যা অন্যের জানা নেই।

হরেন্দ্র ময়রা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, মহারাজ, আমি অতি সাধারণ লোক। আমি কিছু জানি না, কিছুই পারি না।

রাধাকিশোর মুচকি হেসে বললেন, শোন। কয়েকদিন আগে কলকাতার কাছে চন্দননগরে গিয়েছিলাম। সেখানে সূর্য মোদকের তালশাঁস সন্দেশ খেয়েছি। তালশাঁস সন্দেশের আর এক নাম জলভরা সন্দেশ। সন্দেশটি খাওয়ার জন্য ভাঙ্গতেই টুপ করে এক ফোঁটা গোলাপ জল পাঞ্জাবীতে গড়িয়ে পড়ল। তুই পারবি, তালশাঁস সন্দেশ বানাতে? যদি পারিস এক বাক্স

বানিয়ে নিয়ে আসিস। রবিবাবুর মেয়ের বিয়েতে মহিম নিয়ে যাবে। আর যদি না পারিস তবে তোর দোতলাকে খাটো করে আগের মত একতলা বানিয়ে ফেলতে হবে, বুঝেছিস?

হরেন্দ্র ময়রা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। মহারাজা রাধাকিশোর সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, সাধারণ লোক সাধারণের মত থাকবে। বামুন হয়ে কেউ যদি চাঁদের দিকে হাত বাড়ায়, আমি তা মোটেই পছন্দ করি না।

দুই

বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ আর ভীড়ের মধ্যে মহিমকে দেখতে পেয়ে রবিবাবু এগিয়ে এলেন। রবিবাবুর পরনে শুচি শুভ্র গরদের কাপড়, উর্দ্ধাঙ্গ খালি, সেখানে একটা উত্তরীয় গলবস্ত্রের মত দু'পাশে ঝোলানো। ববিবাবুকে দেখাচ্ছে প্রাচীনকালের এক মুনি ঋষির মত স্থিতধী এবং প্রাজ্ঞ। মহিমকে কাছে ডেকে রবিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ত্রিপুরা থেকে আর কে এসেছেন? মহারাজা রাধাকিশোর আসেননি?

মহিম চুপ করে রইলেন। কিছুই বললেন না। তাঁর এখন বলার কথা বড় ঈশ্বরী তুলসীবতী অসুস্থ, তাঁর চিকিৎসা চলছে, তাই মহারাজার আসার ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারেননি। মহারাণী তুলসীবতী অসুস্থ কথাটা ঠিক আবার ঠিকও না। ইদানীং তিনি প্রায়শই অসুস্থ থাকেন। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিছানায় শয্যাশায়ী, হেকিমি থেকে শুরু করে এলোপ্যাথি সব চিকিৎসাই চলছে। কিছুই বাদ রাখা হয়নি। রাণীমা অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী হলেও বরং এখন কিছুটা ভাল। স্ত্রীর আরও বেশী অসুস্থ থাকার সময়ও রাধাকিশোর আগে একাধিকবার কাজে কলকাতায় এসেছেন। একথা রবিবাবু জানেন না যে তা নয়। সুতরাং মাধুরীলতার বিয়েতে না আসতে পারার কারণ হিসেবে যা বলা হচ্ছে, সেটা আর যাই হোক সত্যি না। দীর্ঘকায় শুচি শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত রবিবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে মহিমের মনে হল, রবিবাবুর কাছে মিথ্যে কথা বলা ঠিক না। রবিবাবুর দৃষ্টির সামনে সত্যি গোপন করলে তিনি ধরে ফেলবেন। তার চেয়ে কোন উত্তর না দিয়ে নীরব থাকাই ভালো। রবিবাবু বুঝলেন সব কিছু। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মহিম, কেন আসেননি মহারাজা আজ বেলার বিয়ের দিনে, তা আমি জানি।

মহিম আমতা আমতা করে বললেন, আসলে ব্যাপারটা হল —

রবিবাবু মহিমকে থামিয়ে বললেন, তোমাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, মহিম। আমার যা জানার তা আমি জেনেছি। তুমি এসেছো, মহারাজা তোমাকে পাঠিয়েছেন, আমি খুশী। তুমি অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে বসো। বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেয়ো না। যাবার আগে নৈশভোজটা সেরে যেয়ো। তুমি বলুর বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী। তোমাকে আমি আর কি বলব। তুমি আমাদের ঘরের ছেলে। নিজের মনে করে যা চাইবার চেয়ে নিয়ো। কোন

ত্রুটি হলে নিজগুণে ক্ষমা করো।

রবিবাবু আবেগে এতটা আপ্লুত হয়ে কথাগুলো বললেন যে, মহিম খুবই বিচলিত বোধ করলেন। চারদিকে লোকজন, অতিথি অভ্যাগতের সমাগম। হাওড়া থেকে গঙ্গা পেরিয়ে বরযাত্রীরা এখনই এসে পড়ল বলে। অবশ্য অনেক বরযাত্রী যাঁরা কলকাতার অধিবাসী তাঁরা বর ছাড়া আগেভাগেই জোড়াসাঁকোর বিয়েবাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁদের দেখভাল করতে করতে কন্যাপক্ষের প্রায় হিমশিম অবস্থা।

মহিম যেহেতু বলু বা বলেন্দ্রর বন্ধু এবং যেহেতু রবিবাবু হলেন বলুর রবিকা, তাই মহিম খুবই অন্তরঙ্গভাবে রবিবাবুর কাছে ঝুঁকে বললেন, রবিকা, আপনি একটা ঘরে চলুন। নিভৃতে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব। তাছাড়া আপনার সঙ্গে আমার একটা রাজকার্যও আছে।

কথাগুলো বলে মহিম লঘুভাবে হাসলেন। অন্দর বাড়ির কোনো ঘরই ফাঁকা নেই। বিয়ে উপলক্ষে প্রতি ঘরেই কলকাতার বাইরে থেকে আত্মীয় কুটুম্বেরা এসে দখল করে রেখেছে। রবিবাবু মহিমকে নিয়ে বেশ কয়েকটি ঘর খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত চিলেকোঠার একটি ঘরে এসে পৌঁছুলেন। এটা খালি। এখানে বসে অলস মধ্যাহ্নে রবিবাবু কাব্যচর্চা করেন। টেবিলে দোয়াত কলম কাগজ অবিন্যস্তভাবে পড়ে আছে। রবিবাবু একটা আরাম কেদারায় শরীরটা এলিয়ে দিলেন। সারাদিন প্রায় দাঁড়িয়ে আছেন একদন্ডও বসেননি। খুব খাটুনি যাচ্ছে শরীরের ওপর দিয়ে। তাছাড়া সারাদিন তিনি নিরম্বু উপোস। সম্প্রদানের আগে কিছুই খাওয়া যাবে না। মহিম বসেছেন ঠিক উল্টো দিকে একটা কাঠের চেয়ারে। চিলেকোঠা থেকে নিচে উঠানে বিয়ের আসর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোনরকম ভূমিকা না করে মহিম তাঁর ট্যাক থেকে নীল রংয়ের ভেলভেটের একটা ছোট্ট থলে বের করে রবিবাবুর দিকে বাড়িয়ে বললেন, এটি মহারাজা আপনাকে দিয়েছেন। আপনি এটি রাখুন।

রবিবাবু হাত বাড়াতে গিয়েও হাত গুটিয়ে নিলেন। বললেন, এতে কি আছে?

আজ্ঞে ৬৬৭টি সোনার গিনি। মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। মহিম সহজ এবং অনাড়ম্বভাবে বললেন, মহারাজা জেনেছেন, বেলার বিয়েতে নাকি বিশ হাজার টাকার যৌতুক দিতে হবে। আপনি দশ হাজার টাকা জোগাড় করেছেন। বাকীটা মহারাজা পাঠিয়েছেন।

রবিবাবু জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত ক্ষিপ্রগতিতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। খানিকটা উষ্মাসহ বললেন, মহিম, তোমরা ভেবেছোটা কি? আমার অর্থবল না থাকতে পারে, তাই বলে তোমরা আমাকে বারে বারে অপমান করতে পারো না।

এটা অপমান নয়, রবিকা। মহিম ক্ষীণকণ্ঠে বলার চেষ্টা করলেন। বললেন, আপনি এটাকে অপমান বলে ভাবছেন কেন? মহারাজার চার মেয়ে — অমিয়কুমারী. বিন্দুকুমারী, মাধীকুমারী আর খুকিকুমারী। মহারাজা বলেছেন, মাধুরীলতাও তার আর এক কন্যা। তিনি যদি তাঁর মেয়ে মাধুরীলতার বিয়েতে জামাইকে গিনি দিয়ে বরণ করেন তাতে ক্ষতি বা অপমানটা কোথায়?

মহিম, তুমি যেভাবে কথাটা বললে, ব্যাপারটা অত সহজ সরল নয়। আমি জানি, মহারাজার অন্তরে কোন সংশয় নেই। তিনি বেলাকে নিজের মেয়ের মতই ভালোবাসেন। কিন্তু কথা সেটা নয়। রবিবাবু খানিকক্ষণ থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, আগরতলার রাজদরবারে আমার অবর্তমানে কি কথা হয় আমি সব শুনেছি। তোমাদের মহারাজা সরল সিধে মানুষ, আমি মহারাজাকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিচ্ছি।

মহিম লজ্জায় জিভে কামড় দিলেন। আমতা আমতা করে বললেন, না ঠিক তা নয়। আসলে সর্বত্র কিছু দুষ্টলোক থাকে, তারা সব কিছুতে যা সত্যি নয় তাই আরোপ করে। তাদের ধান্দা অন্য।

মহিম, গুরুগম্ভীর গলায় রবিবাবু বললেন, তুমি এসব কথা বলো না এখন। তোমাদের মহারাজার ঘরে বাইরে বিপদ। চার দিকে ষড়যন্ত্র। ইংরেজরাও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। তারাও সুযোগ পেলে ছেড়ে কথা কইবে না। সে সময় আমি কলকাতা থেকে একজন দক্ষ প্রশাসককে পাঠিয়েছি। সে ঝড়ঝাপ্টা থেকে মহারাজকে বাঁচাবে। এটা খুবই কাকতলীয় ব্যাপার যে ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, আমার দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা রমণীমোহন চ্যাটার্জী। রমণী আমাদের জামাতা এটা কি কোন দোষের হল নাকি। কেউ তো কারোর জামাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র হতেই পারে। কিন্তু তোমরা আগরতলায় বলাবলি করছ, আমি কলকাতা থেকে বকলমে ত্রিপুরা রাজ্যটির শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছি। আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, নাকি?

নিচে থেকে মুহূর্মুহূ উলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শাঁখও বাজল বার কয়। কেউ এল হয়ত বিয়ের তত্ত্ব নিয়ে। মহিম রবিবাবুর কথার তোড়ের সামনে ম্রিয়মান হয়ে রইলেন। এসবের উত্তরে মহিম কি বলবেন— তাঁর কিছু বলার নেই। রবিবাবু ঠিকই শুনেছেন। ইদানীং রমণীমোহনের মন্ত্রিত্বে যোগদানের পর এসব বলাবলি খুবই বেড়েছে। অবশ্য রবিবাবু আগেভাগে নিজেও এরকম আশঙ্কা করেছিলেন। মহারাজার কাছে রমণীর নাম প্রস্তাবের সময় তিনি অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেছিলেন। রমণী তাঁর নিকট আত্মীয় বলে নয়, রাজ্যের সংকটের সময় কোন ব্যক্তির নাম সবিশেষভাবে উল্লেখ করে দায়িত্ব গ্রহণ করা অত্যন্ত কুণ্ঠাজনক। তখন অবশ্য নিতান্তই সুহৃদের কর্তব্য স্মরণ করে সংকোচ অতিক্রম করার তিনি চেষ্টা করেছেন। তিনি তখনই নিশ্চিত জানতেন রমণী প্রধানমন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হলে তাঁকে অনেক গঞ্জনা স্বীকার করতে হবে।

আজকের দুঃখের কারণটা অবশ্য রমণীমোহন নয়। রমণীমোহনের ব্যাপারটা তো আছেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নেয়া না নেয়ার বিষয়টি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য সুযোগ্য সম্পাদক খোঁজা হচ্ছে। তখনকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে রাজী করিয়ে ফেলেছেন। তবু রবিবাবুর মনে দ্বিধা, দায়িত্ব নেবেন কি নেবেন না বুঝে উঠতে পারছেন না। দায়িত্ব নেয়া মানে বঙ্গদর্শন সাহিত্য পত্রিকাটির আগাপাশতলা সব কিছু বদলে ফেলতে হবে। এর জন্য চাই টাকা কড়ি।

ত্রিপুরার মহারাজা সব শুনে রবিবাবুকে গেলবার কলকাতায় আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, 'আপনি অগৌণে এবং অবিচারিত চিত্তে বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করুন এবং আমাকে কি কি করতে হবে বলুন। আমি সর্বতোভাবে এর ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত রইলাম।'

রাজদরবারের সভাসদেরা আগে থেকেই রবিবাবুর খবরদারির ওপর চটে ছিল। এবার বঙ্গদর্শনের অজুহাতে আরও কিছু টাকা পয়সা মহারাজাকে পটিয়ে হাতিয়ে নেবার পরিকল্পনা তারা মোটেই বরদাস্ত করতে রাজী নয়। ঠারেঠুরে তারা মহারাজাকে তাদের অসন্তোষের কথা জানিয়ে দিয়েছে। মহারাজা সর্বময় কর্তা হলেও দরবারের সভাসদদের কথা অনেক সময় ফেলা যায় না। আগরতলায় মহারাজার নাকের ডগায় বসে আছে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি পলিটিকেল এজেন্ট। একটার পর একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে যাচ্ছে বড় লাটের কাছে ডিভিশনাল কমিশনারের মারফৎ। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। এমনিতে রাজপ্রাসাদে ঘাটতি বাজেট চলছে। তার ওপর মহারাজার নিজস্ব দান অনুদানের বিষয়টি অনেক সময় বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রবিবাবু সব জানেন। কলকাতায় বসে থাকলেও কিছুই তাঁর অজানা নয়। বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছিলেন, তিনি আর ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য নেবেন না। তিনি চান না, লোকজন এ নিয়ে নিন্দামন্দ করুক। বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি নেবেন না। হতভাগ্য দেশে প্লেগের প্রকোপ বাড়ছে। এর উপর কাগজ বাড়তে দেওয়া গন্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

রমণীমোহনের নিযুক্তি, বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনার সাথে সাথে অর্থকড়ি আত্মসাতের অভিযোগ সবই রবিবাবু নীরবে সয়েছেন, কিন্তু মহিমের হাতে ভেলভেটের থলেতে মহারাজার পাঠানো বেলার বিয়েতে যৌতুকের জন্য গিনিগুলোকে দেখে অপমানে দিশেহারা বোধ করলেন। মহারাজা স্বয়ং এসে গিনি দিলে হয়ত তিনি ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। কিন্তু মহারাজা আসেননি, দূত মারফৎ যৌতুকের অর্থ পাঠিয়েছেন। রবিবাবু জানেন, কেন মহারাজা নিজে আসেননি। কেননা ফিরে গেলে যৌতুক দানের মধ্যে সভাসদেরা অন্য অর্থ খুঁজে মহারাজাকে গঞ্জনা দেবে। আড়ালে আবডালেও নিন্দুকেরা যেন মহারাজা এবং রবিবাবুকে জড়িয়ে নিন্দে করতে না পারে, সে জন্য বিবেচক মহারাজা লুকিয়ে মহিমকে দিয়ে গিনি পাঠিয়েছেন।

মেয়ের বিয়ে নিয়ে এমনিতেই রবিবাবু বিব্রত ছিলেন। মেয়ের পাকা দেখা কোথায় হবে তা নিয়ে, যৌতুকের টাকার অংক স্থির করা নিয়ে অনেক বাদবিতন্ডা হয়েছে। প্রথমে বিশ হাজার টাকা যৌতুক দাবী করা হলেও পরে পাত্রপক্ষ দশ হাজারে নেমে এসেছিল। আবার কথা নেই বার্তা নেই তার উপর আরো দু'হাজার চাপিয়ে ব্যাপারটাকে কুৎসিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরমাত্মীয়কে প্রসন্ন মনে দান করবার সুখ তাতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এই বিয়েতে পিতা রবিবাবু এবং কন্যার মা মৃণালিনী দেবী, উভয়ের মনের মধ্যে একটি ক্ষতরেখা রয়ে গেল। মৃণালিনী দেবী প্রথম থেকেই এই বিয়েতে যথেষ্ট উৎসাহী হননি। আর কিছুক্ষণের

মধ্যেই বিয়ে, কন্যার সম্প্রদান। এখন এসব মনে ঠাঁই দিতে নেই। এসব ভুলে যাওয়াই শ্রেয়। মঙ্গলকর্ম মঙ্গলের জন্যই হোক।

রবিবাবু খুবই ভারাক্রান্ত মনে বড় মেয়ের বিয়ের শুভলগ্নে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন মহারাজা রাধাকিশোরকে।

বহুলসম্মানপূর্বক নিবেদন —

অনেকদিন পরে মহারাজের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য যৎসামান্য হইলেও এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্মের মূল্য থাকে না —

হঠাৎ হুড়মুড় করে ভাইঝি ইন্দিরা এসে ঘরে ঢুকে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, রবিকা, তুমি এখানে বসে এখন কবিতা লিখছো, অ্যাঁ! বিয়ে বাড়িতে তোমাকে সবাই খুঁজে তোলপাড় করছে। বর এসে গিয়েছে। তুমি এখানে করছটা কি? কবিতা লেখার সময় অনেক পাবে, চলো বেলাকে এখন সম্প্রদান করবে, চলো।

রবিবাবু যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলেন। মনের কষ্ট মনে চেপে রেখে আদরের ভাইঝিকে বললেন, তুই যা নিচে। আমি মহিমকে নিয়ে এখনই আসছি।

ইন্দিরা যেমনি ঝড়ের মত এসেছিল তেমনি ঝড়ের মত আবার চলে গেল।

অর্ধসমাপ্ত চিঠিটা শেষ করে ভাঁজ করে মহিমের হাত তুলে দিয়ে রবিবাবু বললেন, মহিম, আজ আমার মেয়ের বিয়ে। শুভদিন। আজ আমার মন খারাপ হওয়া উচিত না। কিন্তু মন এমন এক বস্তু যে তুমি ইচ্ছে করলে জোর করে তাকে খুশী বা দুঃখী করতে পারো না। যাক্‌গে সে সব কথা। তুমি আমার এই চিঠিটা মহারাজাকে দিয়ো। আর এই গিনির থলেটি নিয়ে ফেরৎ দিয়ো তাঁকে। আমি বন্ধুর দেয়া সাহায্যটুকু গ্রহণ করতে নানা কারণে পারলাম না বলে খুবই দুঃখিত।

মহিমের কাঁধে হাত রেখে রবিবাবু একটার পর একটা সিঁড়ি নেমে বিয়ের আসরে এসে উপস্থিত হলেন। বিয়ের আনন্দোচ্ছল পরিবেশেও তাঁকে ভীষণ ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

তিন

এবার বেশ অনেকদিন পর রবিবাবু আগরতলায় এসেছেন। এবারে আসার কারণটা মূলত সাহিত্য বিষয়ক। দীর্ঘদিন ধরে রবিবাবু অঞ্চল ভিত্তিক স্থানীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপনের কথা বলে আসছিলেন। আঞ্চলিক সাহিত্য পরিষদ গঠিত হলে আশা করা যাচ্ছে সেখানকার সাহিত্যচর্চায় জোয়ার এবং উদ্দীপনা সঞ্চারিত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, এত সদিচ্ছা থাকা

সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র বা পরিষদ কোথাও গড়ে ওঠে নি। বরং সেদিক দিয়ে ত্রিপুরা সত্যি অগ্রগামী। ইতিমধ্যে আগরতলায় 'ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্মিলনীর উদ্বোধনে রবিবাবুকে পৌরোহিত্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। রবিবাবু তাই এসেছেন এবারে আগরতলা। আষাঢ় মাস। স্থানীয় 'উমাকান্ত একাডেমী'তে সভা। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে সারাদিন। সংখ্যার দিক থেকে খুব একটা বিপুল লোকজন নেই। মূলত শহরের গুণগ্রাহী সমাজ উপস্থিত হয়েছেন । আর এসেছেন কবি দর্শন প্রত্যাশী কাব্য পিপাসীরা।

সভার শুরুতে এক অভূতপূর্ব কান্ড ঘটে গেল। শহরের লোকজন যা কোনদিন দেখেনি এবং কোনদিন এরকম হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেনি । ব্যাপারটা এমনিতে কিছু না, আবার অনেক কিছুও বটে। যদিও সভাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে শহরের মধ্যবর্তী স্থান উমাকান্ত একাডেমীর মিলনায়তনে, সেখানে রাজ দরবারের গণ্যমান্য সভাসদেরা উপস্থিত রয়েছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা সবাই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা ভ্রূ কুঁচকে একে অপরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সভায় মঞ্চোপরি একটি আসন মহারাজা রাধাকিশোরের জন্য, আর অন্যটি সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সভারম্ভে সভাপতিকে বরণ করে মহারাজা রাধাকিশোর রবিবাবুকে মঞ্চের উপর সভাপতির আসন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, সেখানে তাঁকে বসিয়ে নিজে মঞ্চের নিচে নেমে এসে সাধারণের সঙ্গে আসন গ্রহণ করলেন। রবিবাবু এতে ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নেমে এসে মহারাজাকে আলিঙ্গন করে উপরে নিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। সেখানে মহারাজার আসনটি শূন্য। রাধাকিশোর অনুরুদ্ধ হয়ে মঞ্চে উঠে উপস্থিত সজ্জনমন্ডলীকে উদ্দেশ করে কিছুটা উচ্চস্বরে রবিবাবুকে বললেন, সাহিত্য ক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্ত বন্ধুমাত্র, এ উচ্চ মঞ্চ আমার স্থান নয়।

কথাগুলো বলে রাধাকিশোর আবার নীচে সবার সঙ্গে এসে, এক সাথে এক সারিতে বসলেন। সভাগৃহ করতালিতে ফেটে পড়ল। সবাই বলল, সাধু, সাধু। দর্শক এবং উপস্থিত প্রজাবৃন্দ মহারাজার বিনম্র ব্যবহারে মুগ্ধ এবং গৌরবান্বিত বোধ করল। রবীন্দ্রনাথ প্রীত হলেও মরমে মরে গেলেন।

সভায় রবিবাবু একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করলেন, প্রবন্ধটির নাম 'দেশীয় রাজ্য'। তাঁর অভিভাষণে ত্রিপুরার জন্য আকর্ষণ ও মমতা প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে ঝরে পড়ল। তিনি বললেন, এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি সংস্কৃত বাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি— 'কিলবিদুর্বীরতাং সারমেকং — বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেন্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশ-কাল পাত্র ভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয় কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্মে বীর কেহ বা কর্মে বীর।'

প্রবন্ধটি পাঠকালীন সভাগৃহ একেবারে নিস্তব্ধ । একটি সূঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে আলাদা করে, এরকম অবস্থা। সভার কার্যসূচী অনুসারে সভাপতির ভাষণের শেষ মানে

সভার সমাপ্তি। কিন্তু ইতিমধ্যে মহারাজা রাধাকিশোরের কিশোর পুত্র লালু, যাঁর ভালো নাম ব্রজেন্দ্রকিশোর, তিনি দৌড়ে মঞ্চে রবিবাবুর কাছাকাছি চলে গেলেন। উপস্থিত অনেকেই রাজকুমারের চপলতায় অস্বস্তি বোধ করলেন। লালু রবিবাবুর কাছে গিয়ে প্রায় ঝুঁকে কানে কানে কিছু বলে আবার ফিরে এলেন।

রবিবাবু অপত্য স্নেহে হেসে ফেললেন। লালুকে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন এবং 'রাজপুত্তুর' বলে ডাকেন। তাঁর অনুরোধ ফেলা কঠিন। লালু রবিবাবুকে একটা স্বরচিত কবিতা পাঠ করার জন্য অনুরোধ করে ভীষণ বিব্রত করে গিয়েছেন। তিনি এখন কি কবিতা পাঠ করবেন, — সেভাবে প্রস্তুত হয়েও আসেননি। সদ্য লেখা একটা কবিতার পুরোটা নয় বরং খানিকটা অংশ মনে পড়ছে। সেটা পাঠ করা আজকের এই সভায় উচিত হবে কি হবে না তা তিনি বুঝতে পারছেন না। এই সভায় অনেকে উপস্থিত আছেন, যারা রবিবাবুকে মোটেই পছন্দ করেন না। রবিবাবুর সব কিছুতে তারা অন্য অর্থ বা স্বার্থ খুঁজে পান। মহারাজা রাধাকিশোরের সঙ্গে কবির বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্যকেও তারা সুনজরে দেখেন না। আসনে বসা নিয়ে মহারাজা রাধাকিশোর সর্বসমক্ষে যা করলেন তাতে তাদের ভালো লাগার কথা নয়। রাধাকিশোর যে সজ্ঞানে এবং ইচ্ছে করেই কান্ডটি করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি এক ঢিলে দু'টি পাখি বধ করতে চেয়েছেন। (এক) রবিবাবুকে বোঝানো, দেখুন লোকে যে যাই বলুক আপনার স্থান কোথায় আমার কাছে এবং আমার ত্রিপুরায়, তা আপনি জেনে যান (দুই) নিন্দুকেরা, তোরাও জেনে যা, তোদের আমি থোড়াই পরোয়া করি।

রবিবাবু মানসিক বৈকল্য বোধটুকু কাটিয়ে উঠে নিজের মন থেকে গমগমে গলায় নিজের কবিতা লালুর অনুরোধ রক্ষার্থে আবৃত্তি শুরু করলেন —

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজে না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা নাহি রে।...

যে আমি স্বপন মুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি
সেই আমি কবি, এসেছ কাহারে ধরিতে?

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমিষের ভারে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে;
কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে।

কবিতাপাঠের শেষে আবার করতালি আর সাধু সাধু উচ্চারণে সারা সভাগৃহ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। রাধাকিশোর মঞ্চে উঠে এসে রবিবাবুকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, দুর্দান্ত কবিতা লিখেছেন আপনি। তবে কবিতাটি শুনে মনে হল আপনার আমাদের ওপর রাগ কমেনি এখনও। আমার দরবারের দিগগজ সভাসদেরা কবিতাটির মর্ম বুঝতে পেরেছে কিনা জানি না। আমি কিন্তু আপনার মনের কথা আর ব্যথাটুকু ধরতে পেরেছি।

রবিবাবু হা হা করে বলে উঠলেন, আরে, কবিতা কবিতাই। এর মধ্যে গভীর কোন অর্থ খুঁজতে যাবেন না।

রাধাকিশোর ভারী গলায় বললেন, আপনার ভাষণে আপনি বীর্যবানদের প্রশস্তি করেছেন। আমার দুঃখ কি জানেন তো, আমার চারপাশে শুধু হীনবীর্যেরা ভীড় করে আছে। নিন্দা আর পরচর্চা করা ছাড়া তাদের পেটের ভাত হজম হয় না। এরা লিলিপুট। এর মধ্যে বড় মাপের কাউকে দেখলে তাকে টেনে নামিয়ে ধরাশায়ী না করতে পারলে এদের মনে সুখ হয় না। আগরতলা একটি দায়িত্ববিহীন গুজব-প্রধান স্থান। তার একমাত্র কারণ বাইরের অকর্মণ্য লোক এখানে এসে তাদের আড্ডা বেঁধে বসেছে। আপনি যদি এ'সব লোকের কু-কথার অর্থ গ্রহণ করেন তাহলে আমার ওপর অবিচার করা হবে। রবিবাবু, আমি আমার প্রজাদের, সভাসদদের আপনার চেয়ে বেশী ভালো চিনি।

রবিবাবু হেসে বললেন, থাক সে সব কথা। আমি ভুলে গিয়েছি সব। আপনি আজ যেভাবে আমাকে সর্বসমক্ষে উচ্চাসনে বসিয়ে সম্মান জানালেন তাতে আমি অভিভূত।

সভা শেষ। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। অতিথি অভ্যাগতরা আটকে পড়েছেন। সভা সমাপ্তিতে মিষ্টির ব্যবস্থা আছে। নগরের গণ্যমান্যরা ভ্রাম্যমান পরিবেশনকারীর ট্রে থেকে পছন্দসই মিষ্টি তুলে নিয়ে খাচ্ছেন। পুরো অনুষ্ঠানটিতে মিষ্টি পরিবেশনের বরাত পেয়েছে হরেন্দ্র ময়রা। হরেন্দ্র তার দোকানের শ্রেষ্ঠ সব মিষ্টির পসরা নিয়ে এসেছে। মিষ্টি খাইয়ে মহারাজা আর তাঁর বন্ধুদের মন জয় করতে পারলে হরেন্দ্র ময়রার লাভ। নচেৎ সমূহ ক্ষতি।

শুরু থেকেই হরেন্দ্র ময়রা উমাকান্ত একাডেমীর সভাগৃহে উপস্থিত। অনুষ্ঠানটি তার ভালো লাগলেও পুরো ব্যাপারটি তার বোধগম্য হয়নি। যে মহারাজা তাঁর নিজের বাড়ি থেকে অন্যের বাড়ি উঁচু হলে রাগ করেন, সেই মহারাজাই অন্য একজনকে উঁচুতে বসিয়ে নিজে নিচে বসেন কি করে? আসলে রাজা মহারাজাদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা, উলুখাগড়ার মত সাধারণ মানুষ হরেন্দ্র ময়রার এগুলো বোঝার কথা নয়।